সতুর মা

"দময়ন্তীকথা" রচয়িত্রী

শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত।

কলিকাতা

১৩১৪

মূল্য ১।০

প্রকাশক

শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

নং ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার,

৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
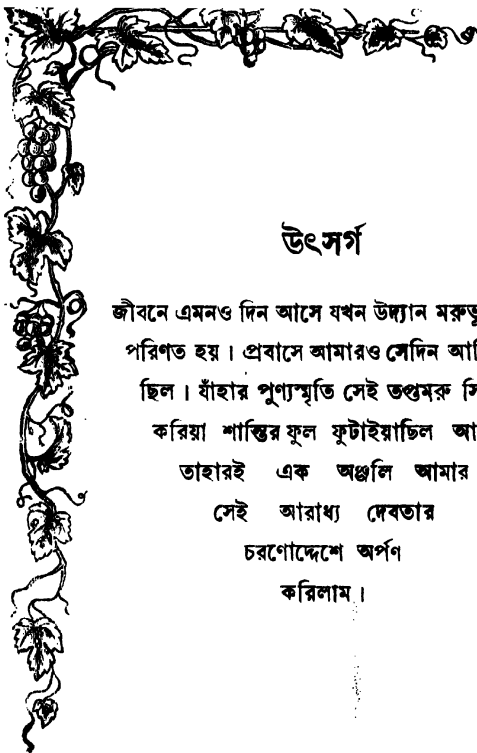
উৎসর্গ

জীবনে এমনও দিন আসে যখন উদ্যান মরুভূমিতে
পরিণত হয়। প্রবাসে আমারও সেদিন আসিয়া-
ছিল। যাঁহার পুণ্যস্মৃতি সেই তপ্তমরু সিক্ত
করিয়া শান্তির ফুল ফুটাইয়াছিল আজ
তাহারই এক অঞ্জলি আমার
সেই আরাধ্য দেবতার
চরণোদ্দেশে অর্পণ
করিলাম।

ভূমিকা

এই গল্পগুচ্ছের লেখিকার সহিত সাময়িক পত্রের পাঠক-পাঠিকাগণের কিছু কিছু পরিচয় আছে।* তাঁহার লেখার ভিতর এরূপ লক্ষণ সকল আছে যাহা দেখিয়া মনে হয়, এই স্বল্প পরিচয় ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া খ্যাতিতে পরিণত হইবে।

আজকালকার ছোটগল্পলেখকগণের মধ্যে অনেকেই উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র আঁকিতেই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থকর্ত্রী সংযমের চিত্র আঁকিতেই ভালবাসেন, এবং অঙ্কনেও নিপুণতা আছে। গল্পগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। আমাদের অন্তঃপুরের মা লক্ষ্মীরা যদি নির্ব্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ না করিয়া এই শ্রেণীর গল্পের পক্ষপাতিনী হয়েন তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে এবং গল্পসাহিত্যের বিপথগামিনী গতিও ক্রমে সুপথে ফিরিবে। ইংরাজী বাঙ্গালা অনেক গল্প পড়িয়াছি, কোন কোন স্থলে চক্ষের জলও ফেলিতে হইয়াছে, পরন্তু "সতুর মা" পাঠ করিতে বসিয়া স্থানে স্থানে বিশেষ শেষকালে যে ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইল তাহা এক নূতন ধরণের। সাধারণ ভাবের ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া কল্পনার সাহায্যে সাধ্যমত সাজাইয়া আজকাল অনেকেই গল্প লিখিতেছেন, কিন্তু

---

* ইতোপূর্ব্বে লেখিকার গল্প ও প্রবন্ধ এবং তাঁহার প্রথম পুস্তক "প্রয়াগ প্রবাসিনী" এই ছদ্ম নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকলেখিকাগণের ছদ্মনামে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করার প্রথা নূতন নহে।—চ, সেন।

সতুর মা'র জীবন গ্রন্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে তাহার অভিনবত্ব অতি উপাদেয়। "সতুর মা"কে বা "বীণার বিবাহ"* যে তুলিতে আঁকা হইয়াছে সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা যে-সে চিত্রকরের কাজ নয়। শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে তাহা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল এবং করুণরসাত্মক হইয়াও অতীব মধুর। ঐ তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অন্যগল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য।

"সতুর মা" পড়িয়া যে টুকু আনন্দ ও উন্নতি লাভ করিলাম, তদ্বিনিময়ে লেখিকাকে আমি কি দিতে পারি জানি না; তিনি আমার কন্যাস্থানীয়া; আশীর্ব্বাদ করি তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়খানি আরও প্রশস্ত হইয়া বিশ্বপ্রেমে পরিপ্লুত হউক—দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়া তিনি সমাজের কল্যাণ সাধনে যত্ন করিতে থাকুন।

কলিকাতা
৩রা মার্চ্চ ১৯১৮।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

* "বীণার বিবাহ" ১৩১৬ সালের "সুপ্রভাত" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ বৎসরের "বঙ্গ সাহিত্যের বিবরণ" লেখক মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, এ বৎসরের মধ্যে যতগুলি ছোট গল্প বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে এই গল্পটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।—প্রকাশক।

সূচী

সতুর মা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সহায়সম্বলহীনা অনাথা নবদুর্গার দুরদৃষ্ট যখন তাহাকে মজুমদার গৃহে কর্ম্ম লইতে বাধ্য করে, মজুমদার-গৃহিণী পঙ্কজিনী তখন একটি পুত্র কামনায় হতাশ হইয়া নিতান্ত মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। একটি সন্তানের অভাব, তাঁহার জীবনটাকে একবারে লক্ষ্যহীন অবসাদগ্রস্ত করিয়াছিল। তাঁহার বিষয় বৈভব সমস্তই যেন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। শিশুর হাস্য কোলাহলশূন্য নির্জ্জন প্রবাসগৃহ ক্রমে তাঁহার বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছিল।

নবদুর্গা কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিল, এত সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও তাহার কর্ত্রীঠাকুরাণীর মনের দুঃখটা কি? স্নেহ প্রেমে গঠিত সুকোমল নারীহৃদয়ে বেদনাটা তাঁহার কোন্‌খানে?

নবদুর্গার কোলে সতু তখন নিতান্ত শিশু ; তখনও তাহার রুচিমুখে কথা ফুটে নাই, দুর্ব্বল চরণ দুখানি দেহ-ভার বহনে সমর্থ হয় নাই। সে শুধু তখন তাহার ইন্দু-নিভাননের সুধাহাস্যে জননী-হৃদয়ের শোক তাপ দূর করিতে, শত্রু মিত্রের অন্তর সমভাবে আনন্দাপ্লুত করিতে শিখিয়াছে মাত্র।

বড় যত্নের—বড় আদরের সতুকে, নবদুর্গা তখন আবশ্যক মত দুধ যোগাইতে পারে না, ইচ্ছানুরূপ শয্যা পরিচ্ছদাদি দিতে, দুইদণ্ড কোলে লইয়া স্থির হইয়া বসিতে সময় পায় না, দিনরাত যাহাকে বক্ষে রাখিতে সাধ, সে সোনার যাদুকে মাটিতে ফেলিয়া, তাহাকে নূতন কাজ বজায় রাখিতে হয়।

আশ্চর্য্য বিধির বিধান! একই সময়ে পঙ্কজিনী যখন সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে পুষ্প-কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহার সমস্ত বিষয় বৈভব তাঁহার জীবনে সকল সাধ আহ্লাদ একটি সন্তানের অভাবে ব্যর্থ হইল ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, দুঃখিনী নবদুর্গা তখন তাঁহারই গৃহ প্রাঙ্গনে কঠিন ভূমিশয্যায় তাহার ননির পুতলি সতুকে শোয়াইয়া ধনী গৃহের আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করিতে করিতে—অর্থাভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশু দুগ্ধ যোগাইতে

পারিতেছে না বলিয়া গভীর বিষাদে অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করে।

মাটিতে পড়িয়া সদানন্দ শিশু মনের আনন্দে হাত পা নাড়িয়া খেলা করে আর হাসে। মায়ের প্রাণ তাহাতে কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু পঙ্কজিনীর চোখ তাহা হইতে ফিরিতে চায় না। কি কোমল তা'র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটীতে কি সুন্দর হাসিই ফুটিয়া উঠে! শিশুর দৃষ্টি কি মধুর! পঙ্কজিনী যতই দেখেন, ততই তাঁহার ভাল লাগে—ততই ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কি জানি কি ভাবেন, মনে মনে বলেন—"পরের ছেলের প্রতি আর মায়া বাড়াব না"। স্বর্গের শিশু সে, কি জানে আপন আর পর? সতু তাহার দুঃখিনী মায়ের প্রতি চাহিয়া যেমন মিষ্ট হাসি হাসে, যেমন বুকে উঠিবার জন্য মোমের মত কোমল হাতদুটী বাড়াইয়া দেয়, রাজার রাণী পঙ্কজিনীকে দেখিয়াও তেমনি মধুর হাসে, আর তেমনি করিয়া হাত বাড়াইয়া দেয়। কি মায়াবী ছেলে! পঙ্কজিনীর কাজ নাই—কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি, কোন না কোন ছুতায় শিশুর নিকট দিয়া চলিয়া যায়, আর সেই সময় একবার তাহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি ফেলিয়া যায়।

এক মাস যায় দুমাস যায়, সতুকে দেখিয়া দেখিয়া পঙ্কজিনীর আর আশা মিটে না। পঙ্কজিনী এখন মধ্যে মধ্যে শিশুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার গণ্ডদ্বয় ও চিবুকটী দুটী আঙ্গুলে ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া যান, কখন তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি নিজের দুই করতলে ধরিয়া দোল দিয়া যান, আর বলেন "কি শান্ত ছেলে, মায়ের সঙ্গে কোন খোঁজ নেই, পেটটীও পড়ে গেছে, তবু দেখ কেমন হাত পা নেড়ে খেলা কচ্ছে, কাঁদতে যেন জানে না!" ধীরে ধীরে ঐ ক্ষুদ্র যাদুকর পঙ্কজিনীর হৃদয় মন আকর্ষণ করিতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধা পঙ্কজিনী আজ কাল নির্জ্জন কক্ষে শয়ন করিয়া ভাবেন—"ঝীয়ের ছেলে সতু—আমার ত কেউ নয়, কিন্তু, আমি তাকে একদিন না দেখ্‌লে, একবার কোলে না নিলে থাক্‌তে পারি না কেন? তবে কি সতুর উপর আমার মায়া পড়েছে"? আবার ভাবেন "আচ্ছা সতুর যদি অসুখ হয়? না না ও সব মিছে ভাবি কেন? আচ্ছা যদিই হয়, তা হোক্ না সতু ঝীয়ের ছেলে, অসুখ হলে কি আর আমি ফেলে রাখব? —আচ্ছা থাক্, নবদুর্গা যদি আর এখানে কাজ না করে? সতুকেও ত তাহলে নিয়ে যাবে!" পঙ্কজিনী শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার কত কথাই মনে হইল।

নবদুর্গাকে অন্যত্র যাইতে দিতে পঙ্কজনীর মন কোন মতেই চাহিল না। তিনি মনে মনে সম্ভব অসম্ভব কত মতলবই আঁটিলেন। যেমন করিয়াই হউক সতুকে তিনি আপনার করিয়া লইবেন। একদিন সকলের অলক্ষ্যে সতুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পঙ্কজিনীর মনে নবদুর্গার কোল হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইতে ইচ্ছা হইল। শিশুর মাতার মৃত্যুকামনাও তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কোণে স্থান পাইতে চাহিল। পঙ্কজিনী আবার শিহরিয়া উঠিলেন। মুগ্ধা আপনাকে তিরস্কার করিলেন। বিবেক বলিল "ছিছি পঙ্কজিনী তুমি এতই স্বার্থপর!" পঙ্কজিনীর দুই নয়ন প্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা জল সতুর মাথায় গড়াইয়া পড়িল। শিশুকে বুক হইতে নামাইয়া পঙ্কজিনী ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে চিন্তাকুল হৃদয়ে আপনার কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন।

পঙ্কজিনীর স্বামী যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন বালিশে মাথা রাখিয়া পঙ্কজিনী শয্যায় উঠিয়া বসিয়া আছেন। মজুমদার মহাশয় অতি যত্নে দুই হাত দিয়া মাথাটী তুলিয়া ধরিলেন; দেখিলেন বালিশটী চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে! তিনি সকল কথা শুনিলেন, কিন্তু অভাগিনীকে তাহার হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি হইতে

বঞ্চিত করিয়া নিজে সুখী হইতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। কিন্তু পঙ্কজিনীর চোখের জল তাঁহার নীতিকঠোর হৃদয় গলাইয়া দিল। ক্রমে পঙ্কজিনীর মন শিশুর প্রতি যতই আকৃষ্ট হইতে লাগিল ততই তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় ধীরে ধীরে স্বার্থপঙ্কিল হইতে লাগিল। উভয়েরই বিবেক অজ্ঞাতসারে মলিন হইয়া আসিল।

অবশেষে পঙ্কজিনী অর্থের দ্বারা নবদুর্গাকে বশীভূত করিয়া সন্তানটিকে লইবার সঙ্কল্প করিলেন। স্বামীর নিকট তিনি আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে এবার তিনিও সম্মতি দিলেন। নবদুর্গা ভদ্রঘরের মেয়ে দারিদ্র্যদুঃখে পড়িয়া অন্নের কাঙাল হইয়াই না আজ তাহার গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছে, তাহার ছেলে লইতে দোষ কি? লইতে দোষ নাই, কিন্তু দেয় কে? উভয়ের মনে প্রশ্ন উঠিল, নবদুর্গা কি সত্ব ছাড়িয়া সন্তানটিকে তাঁহাদের দিতে পারিবে? স্বামী স্ত্রীর মনে নব আশা জাগিল, পঙ্কজিনীর অন্য চিন্তা দূরে গেল, নিশিদিন ঐ এক চিন্তাতেই তিনি বিভোর হইয়া রহিলেন; সতুকে অবলম্বন করিয়া কত আনন্দপ্রদ কল্পনা তাঁহার অন্তর ব্যাপিয়া রহিল।

কল্পনা ক্রমে সত্যে পরিণত হইল। দুঃখিনীর সন্তান সৌভাগ্যবতীর অঙ্কে স্থান পাইল। বহু চেষ্টার ফলে

পঙ্কজিনী নবদুর্গার সন্তানটিকে "আমার" বলিবার অধিকার পাইলেন। তাঁহার মাতৃস্নেহপূর্ণ হৃদয় জগতের সকল সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া একটি শিশুসন্তানকে বক্ষে পাইবার জন্য নিশিদিন আকুলী বিকুলী করিতেছিল, আজ সতুকে পাইয়া পঙ্কজিনীর সে অশান্ত হৃদয় শান্ত হইল।

নবদুর্গা অর্থের বিনিময়ে সন্তান দিল না, কিন্তু স্বর্গীয়-ভাবে পূর্ণ হইয়া সন্তানহীনার অভাব মোচনের জন্যই সে তাহার ধন্নাধরা কামনা-করা পুত্ররত্নটিকে অসময়ের আশ্রয়-দাত্রী প্রভুপত্নীকে দান করিল। দুঃখিনীর এই মহাদান কেহ জানিল না—দেখিল না। নিতান্ত গোপনে, লোক-লোচনের অগোচরে মজুমদার-দম্পতি ইহা গ্রহণ করিলেন।

সাক্ষী রহিলেন সর্ব্বদর্শী ভগবান্। আর জগতবাসীর মধ্যে সাক্ষী রহিলেন মজুমদার মহাশয়ের আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষক নীলমণি গাঙ্গুলি। মজুমদার-দম্পতি তাঁহাকেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন,—প্রাণান্তেও তিনি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

স্বাভীষ্টলাভে হৃষ্ট মজুমদার-দম্পতি এইবার এস্থান ত্যাগ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন, বিশেষ চেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যে এ আশাও তাঁহারা পূর্ণ করিতে পারিলেন।

বদলির দরখাস্ত মঞ্জুর হইতেই নব আশা—নবীন আনন্দে উৎফুল্ল পঙ্কজিনী স্বামীর সহিত নূতন স্থানে আসিলেন। পুরাতন পাচক পরিচারকগণের সকলে যেখানকার লোক সেখানেই রহিল, সঙ্গে থাকিলেন কেবল গাঙ্গুলি মহাশয়, আর থাকিল নবদুর্গা; তাহাকে ইহাঁরা ছাড়িতে চাহিলেও সে কোনমতে ইহাঁদের সঙ্গ ছাড়িল না। কেবল সে যখন বুঝিল পঙ্কজিনী তাহার সর্ব্বস্বধন হাতে পাইয়া এখন তাহাকে এড়াইতে পারিলেই স্বচ্ছন্দ হন, তখন তাহার সাদা প্রাণে আঁচড় পড়িল, ব্যথার পরে ব্যথা বাজিল।

অর্থদানে তুষ্ট করিয়া নবদুর্গাকে বিদায় করিতে পারিলেই পঙ্কজিনী নির্ভাবনা হইতেন, কিন্তু তাহা হইল না। নবদুর্গা প্রভুপত্নীর প্রদত্ত অর্থ ও সুপরামর্শের প্রতি কিছুমাত্র আগ্রহ প্রদর্শন না করিয়া তাঁহাদের অনুমতির অপেক্ষায় না থাকিয়া, কোনক্রমে এই গৃহে একটু স্থান করিয়া লইয়া চিরস্থায়ী হইল। পঙ্কজিনী আর বাধা দিতে পারিলেন না।

নবদুর্গার জীবনের আর এক অঙ্কের আরম্ভ হইল। ভদ্রগৃহস্থ-বধূ নবদুর্গা অবস্থা বিপর্যায়ে পড়িয়া যে সতুকে কোলে লইয়া জগতে মাতৃত্বের অধিকার পাইয়াছি ভাবিয়া

নিঃশঙ্কচিত্তে পরের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারিয়াছিল—দরিদ্র স্বামীর মৃত্যুর পর ডাক্তার কবিরাজের ঋণ পরিশোধে কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও নিজেকে অমূল্য সম্পত্তির অধিকারিণী বোধে শত দুঃখ দৈন্যেও নিশ্চিন্ত ছিল, তাহার অমূল্য সম্পত্তি সেই সতুধন আজ অন্যের হইল, সতুর উপর তাহার দাবি দাওয়া কিছুই রহিল না, নিজের অবশিষ্ট সম্বল পরহস্তে তুলিয়া দিয়া আজ দীনা কাঙ্গালিনী নবদুর্গা কর্ত্তা গৃহিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে মজুমদার ভবনের একপ্রান্তে রন্ধন গৃহের পার্শ্বে ক্ষুদ্র একখানি টিনের ঘর অধিকার করিয়া রহিল।

যদিও নবদুর্গা বুঝিয়াছিল তাহার সতু এখন হইতে মজুমদার-দম্পতিরই নিজস্ব হইল, তাহার আর সন্তানের উপর কোন দাবি-দাওয়া রহিল না, এমন কি, তাহাকে 'আমার' বলিবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত সে হারাইল, তবু সতু যে তাহার নয়ন সম্মুখেই রহিল, নিঃসন্তান ধনী দম্পতির স্নেহরাজ্যে একাধিপত্য লাভ করিয়া অতুল সোহাগে, অসীম যত্নে প্রতিপালিত হওয়ায় এক সময়ে সতুর যে সুকুমার দেহ উপযুক্ত দুগ্ধ ও শয্যা বসনাদির অভাবে শীর্ণ মলিন হইতেছিল এখন দিনে দিনে মাসে মাসে সেই দেহে অপূর্ব্ব লাবণ্যের বিকাশ হইতে লাগিল, তাহাতেই নবদুর্গার মনে

ক্ষোভ আর স্থান পাইল না, বরং আপন অধিকারচ্যুত হইয়াও সতুর সহিত একই গৃহে বাস করিতে পাওয়ায় তাহার আশা হইল, সতুকে কোলে লইয়া—তাহার মুখে অমিয় হাসি দেখিয়া জীবনের দুঃখ শোক ভুলিতে পারিবে, এমন কি নিজের অন্তরের আশা আদর্শ দিয়া তাহার শিশু-হৃদয়টি গঠিত করিয়া তুলিতে পারাও হয়ত অসম্ভব হইবে না। কিন্তু, এ আশা তাহার ফলবতী হইল না। সতুর মুখে অমিয়মাখা মা বুলি ফুটিবার পূর্ব্বেই পঙ্কজিনী তাহার সে ভুল ভাঙ্গিলেন। দুঃখিনীকে আশাহত করিয়া কর্ত্রী-ঠাকুরাণা যে নূতন হুকুম জারি করিলেন, তাহাতে নবদুর্গার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সতুর নিকট হইতে তাহাকে সর্ব্বদা দূরে রাখাই কর্ত্রীর এই নূতন আদেশের উদ্দেশ্য। প্রাণপণ-বলে নবদুর্গা তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া নীরবে কর্ত্রীর সে নিষ্ঠুর আদেশ শিরোধার্য্য করিল।

দিনের পর দিন সতুর দেহে লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। সতু দোলনা ছাড়িয়া "হাঁটি-হাঁটি-পা-পা" করিতে শিখিল, মুখে মধুর আধবুলি ফুটিল, শিশু-স্বভাব-সুলভ হর্ষ-চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল, তাহার সরল তরল সুধাহাস্যে সোহাগ-ক্রন্দনে পঙ্কজিনীর নীরব কক্ষ

মুখরিত হইল। সতু মজুমদার-দম্পতিকে মা বাবা বলিয়া চিনিতে ও ডাকিতে শিখিল। উভয়ের অন্তর ছাপাইয়া আনন্দের স্রোত বহিল, চোখে মুখে অপূর্ব্ব পুলকদীপ্তি প্রকাশ পাইল। নিঃসন্তান দম্পতির বৈচিত্র্য-বিহীন বিষাদময় জীবনে ক্ষুদ্র শিশু ধীরে ধীরে আবার আশা আনন্দ ও উৎসাহ জাগাইল। সতুর "সতু" নাম লুপ্ত হইল, তাহার নাম হইল "রাজেন্দ্র"! পিতামাতার কাছে সতু রাজেন্দ্র ও তাঁহাদের আশ্রিত কর্ম্মচারী দাস দাসী প্রভৃতির নিকট "রাজাবাবু" নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ভ্রমক্রমেও কোন দিন "সতু" নাম মুখ হইতে উচ্চারিত না হয়, নবদুর্গাকে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। নবদুর্গার প্রাণে আঘাতের পর আঘাত পড়িল, বড় জোরে একটা নিশ্বাস অনেকখানি হুতাশের সহিত অন্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। নবদুর্গা নীরবে এ প্রস্তাবেও সম্মত হইল। সেলাইয়ের কলটি যেমন চালকের পদ বা হস্ত তাড়নে বাধ্য হইয়া সুন্দর কোমল রেসমী রুমালখানির কিনারায় সূচীবিদ্ধ করিয়া ষ্টিচের পর ষ্টিচ্ ফেলিয়া যায়, নবদুর্গাও ধর্ম্মবুদ্ধির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তেমনি আপন দীন বেদনাতুর হৃদয়-খানার প্রতি লক্ষ্য মাত্র না রাখিয়া নীরবে নিয়মিতরূপে

নিজের কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু, শত চেষ্টাতেও নবদুর্গা চিত্তের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ-রূপে গোপন রাখিতে পারিল না। কর্ত্তব্য সম্পাদনেও তাহার প্রতিপদে ভুল ভ্রান্তি দেখা যাইতে লাগিল। নৈমিত্তিক কর্ম্ম কাজের মধ্যে সময়ে সময়ে সহসা নবদুর্গার মনের অবস্থা এমনি দাঁড়ায়, যখন সে কর্ত্রীঠাকুরাণীর সকল বিধি নিষেধ মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যায়। সতুর মা, না বলিয়া তাহাকে নবদুর্গা বলিয়া ডাকিলে তাহার চোখে জল আসে। সতুর হাস্য ক্রন্দনে আকৃষ্টা হইয়া, যে স্থানে যাওয়া নিষেধ, অন্যমনস্ক ভাবে সে স্থানে সে গিয়া পড়ে। লোকলোচনের অন্তরালে মুহূর্ত্তের জন্যও সতুকে একা পাইলে সকল ভুলিয়া সাদরে বক্ষে তুলিয়া লইয়া শত স্নেহ চুম্বনে তাহার কোমল কপোলে রক্তকমল ফুটায়, অবোধ শিশু সে স্নেহচুম্বনে সোহাগে গলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে—বাৎসল্যরসাপ্লুতা জননীর স্তন হইতে অমৃত ক্ষরিতে থাকে, অন্তর পুলক-বিহ্বল, নয়ন সলিলার্দ্র হয়। কিন্তু সে কতক্ষণ? নিমিষের সুখ নিমিষে ফুরায়! সহসাগতা পঙ্কজিনীর তীক্ষ্ণ বাণের মত ভর্ৎসনাসূচক দৃষ্টি, তাহাকে ব্যাকুল, ব্যথিত, ত্রাসিত করিয়া অবিলম্বে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করে। দুঃখিনীর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় না। মর্ম্মভেদী

দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশে, অশ্রুবিন্দু নয়নেই অদৃশ্য হয়, ঝরিয়া পড়িবার দুঃসাহস তাহারা রাখে না।

লোভ বড় ভয়ানক! লোভের ন্যায় শত্রু মানুষের আর নাই; আরম্ভেই সতর্ক না হইলে সর্ব্বনাশ! ইহার দায় এড়ান কঠিন। নবদুর্গা সত্ব ছাড়িয়া সতুকে মজুমদার দম্পতিকে দান করিতে পারিল, ভবিষ্যতে তাহাকে অবলম্বন করিয়া লুপ্ত-সংসার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার, তাহারই কল্যাণে সুখ সৌভাগ্য ও স্বাধীনতা লাভ করিবার বাসনাকে হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়া চিরদাসীত্ব স্বীকার করিতে পারিল, কিন্তু সুযোগ পাইলেই সতুকে কোলে লইবার, তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহহস্ত বুলাইতে বুলাইতে সভয় চকিত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে, দিনান্তে একটিবার তাহাকে স্তন্যপান করাইবার লোভটুকু তাহার সম্বরণ করা দুরূহ হইল! নবদুর্গা অতি লোভ অতি সহজেই সম্বরণ করিল, কিন্তু, তুচ্ছ লোভ তাহার অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল! ক্রমে পঙ্কজিনীর দৃষ্টি এড়াইয়া সতুর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ অন্বেষণ, তাহার নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে একটী প্রধান কার্য্য হইল।

সতর্কতা সত্বেও কিন্তু নবদুর্গা বেশী দিন কর্ত্রীঠাকুরাণীর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না, চতুরা পঙ্কজিনী কৌশলে

নবদুর্গাকে তাঁহার সন্তানের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিলেন। ভবনের যে যে অংশে রাজেন্দ্রের গতিবিধির সম্ভাবনা কম, সেই সেই অংশে তাহার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। নবদুর্গা সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া বিরাম-হীন কর্ম্মে আপনার সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়া কর্ত্রীর প্রসন্নতা লাভ করিবার যত্ন করিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভগা সে, তাহাকে প্রসন্ন করিবার একমাত্র উপায় ছিল —নবদুর্গার চিরদিনের জন্য এ ভবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন। নবদুর্গা কিন্তু তাহা পারিল না।

রাজেন্দ্রের বয়স যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হইতে লাগিল—তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ভবিষ্যতে তাহাকে উন্নতির উচ্চ সোপানে উন্নীত করিবার আশা দিতে লাগিল, পঙ্কজিনী সভয় অন্তরে ততই নব-দুর্গাকে তাহার দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাবনা—পাছে নবদুর্গা সন্তানপ্রীতি-বসে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহার কোল হইতে এত সাধের রাজেনকে কাড়িয়া লয়। ভয়—নবদুর্গার অসাবধানে পাছে কোন অশুভ মুহূর্ত্তে সত্য কথাটী রাজেন্দ্রের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে। শেষে পঙ্কজিনীর অত্যন্ত সাবধানতায়, সতুকে কোলে লওয়া আদর যত্ন

করা ত দূরের কথা দিনান্তে একবার সতুর দর্শন লাভেও নবদুর্গা বঞ্চিতা হইল। সে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল —আর সে সন্তানের জননী নয়,—স্বামীর পত্নী নয়, পিতামাতার কন্যা নয়, ভ্রাতার ভগ্নী নয় ; ভদ্র পরিবারের বধু নয়, নির্ম্মম অকৃতজ্ঞ ধনী দম্পতির দুর্ভগা পরিচারিকা সে,—প্রাণহীনা ক্রীতদাসী সে,—তুচ্ছ সে,—ধরণীর ধূলা সে ;—তাহার হাস্য-ক্রন্দনে, হর্ষ-বিষাদে কাহারও কিছু আসে যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৌষের শেষ। সেদিন ভয়ানক শীত—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে, তখনও রৌদ্রের মুখ কেহ দেখিতে পায় নাই। বাগানের গাছ-পালা হইতে রাত্রির শিশির তখনও অবিরাম ঝরিতেছে, ফুল-গুলি হিমে মুশড়িয়া আছে। কন্‌কনে হাওয়ায় মানুষের পঞ্জর যেন খসিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, পশুপক্ষিগুলা পর্য্যন্ত শীতে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিঃসন্দেহ এই শীতে গঙ্গাসাগরের যাত্রীরা পৌষসংক্রান্তিতে প্রাতঃস্নান করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে, আর দেশের যত থুত্থুরে বুড়ো বুড়ি, পুরাতন রোগী কেউ কোথাও থাকিবে না, তাহাদের ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে—এই মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে বামুন ঠাকরুণ দো-পাকা উনানে ডাল চচ্চড়ি চড়াইয়া ভাতের ফেন গালিতেছেন, আর নব-দুর্গা স্নান-শেষে একখানা আধময়লা কাপড় বেড় দিয়া পরিয়া শীতে হি হি করিতে করিতে রান্নাঘরের দালানে বসিয়া তরকারি কুটিতেছেন—শোনা গেল উপরে ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন। পদ-শব্দে বোধ হইল ডাক্তারবাবু

কর্ত্তাবাবুর শয়নকক্ষে যাইবার জন্য ত্রিতলের সিঁড়িতে উঠিতেছেন।

বামুনঠাকরুণ রন্ধনে ব্যস্ত, এ শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না, কিন্তু নবদুর্গা হঠাৎ ডাক্তারবাবুর আগমনের কারণ না বুঝিয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল। "ডাক্তার আসিয়াছেন, অবশ্যই কাহারও অসুখ; কিন্তু, কাহার অসুখ? বাড়ীতে লোক অনেক কিন্তু আজকালের মধ্যে কাহারও অসুখ হইয়াছে বলিয়া ত সে শুনে নাই? কর্ত্তাবাবু, দিদি-ঠাকরুণ—তাঁরাও ত ভাল আছেন; রাত্রে গিন্নি আমার সামনেই বামুনঠাকরুণকে সকালের জন্য ভাঁড়ার বা'র করে দিয়ে গেলেন; কই তাঁর ত অসুখের কোন লক্ষণ দেখলুম না? অন্য দিন যেমন কালও তেমনি, কিন্তু হাঁ! মনে পড়চে বটে, অন্য দিনের চেয়ে কাল দেখলুম একটু বেশী তাড়া-তাড়ি উপরে উঠে গেলেন, কারও সঙ্গে কথা কইলেন না; কারও ভাল মন্দ কাজ দেখে শুনেও কিছু বল্লেন না; মনটার যেন বড় ঠিক নেই, চিন্তিত অন্যমনস্ক। হাঁ হাঁ মুখ-খানাও বড় বিষণ্ণ-মত দেখেছিলুম মনে হচ্চে! এমন কেন হ'ল?"—ভাবিতে ভাবিতে নবদুর্গার সতুর কথা মনে হইল। "হাঁ তাইত কই সতুকে ত কাল স্কুলে যেতে, বাগানে খেলতে যেতে দেখিনি? আজ এখন পর্য্যন্ত একটাও কথার

আওয়াজ পাইনি কেন? সতুর কি তবে কোন অসুখ হয়েচে? সে কি আজ বিছানা থেকে উঠতে পারেনি?”

সতুর কথা ভাবিতে ভাবিতে নবদুর্গা কপিতে ফালা দিতে গিয়া নিজের আঙুলে ফালা দিয়া বসিল; কপির ধব্‌ধবে সাদা ফুলটী রক্তে লাল হইয়া গেল। রান্নাঘর হইতে বামুনঠাকরুণ হাঁকিলেন, “ঝোলের কুট্‌নো, মাছের ঝোলের কুটনো এখনও দিয়ে গেলে না, আটটা বেজে গেল, ঝোল চড়াতে পারলুম না; শীতের বেলা দেক্‌তে দেক্‌তে বেড়ে যাবে, কর্ত্তাবাবুকে আপিষের ভাত দেব কখন্ গো?” এমন সময় দালানের দিকে ফিরিতেই বামুনঠাকরুণের দৃষ্টি পড়িল রক্তমাখা কপিটা আর নবদুর্গার কাটা আঙুলটার দিকে। নবদুর্গা তখন যত জলে ডুবাইয়া আঙুলটার রক্ত বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি বামুনঠাকুরুণের হুকুম তামিল করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ততই নূতন রক্ত আনাজ তরকারি থালা বাটি আর জলকে রঙাইয়া তুলিতেছিল।

বামুনঠাকরুণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—“ওকি! আঙুল কেটে বস্‌লে নাকি? ভাল জ্বালা যাহোক, দিন দিন যেন তোমার কাজ কর্ম্ম কি হয়ে যাচ্চে, এখন যাও সরে বস, আমি নিজেই কুটে নিই। তোমার কি? তুমি এখন হাত কেটে বসে রইলে আমায় ত রাঁধতে হবে, সময়ে

আপিষের ভাত না দিতে পাল্লে জবাব ত আমাকেই দিতে হবে ?" আপনার মনে গজ গজ করিতে করিতে ক্ষিপ্র-হস্তে বামুনঠাকরুণ আলু কপি কুটিতে লাগিলেন। নবদুর্গার কানে গেল কর্ত্তাবাবু বলিতেছেন—"অসুখ কি বড় শক্ত বোধ হল ? একদিনেই এতটা বেড়ে গেল !" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"একদিন, একদিন ত বেশী সময়, এক বেলায় রোগ বেড়ে যায় ! যাহোক ভাববেন না, অষুধ দুটো শীঘ্র আনিয়ে নিন্ আর যেমন যেমন বলে গেলুম ঠিক ঠিক করতে বলবেন ওবেলা আবার আমি দেখে যাব।" তারপর দুজনের পদশব্দ শুনা গেল। নবদুর্গা বুঝিল বাহিরের দিকের সিঁড়া দিয়া ডাক্তারের সঙ্গে কর্ত্তাবাবু নীচে নামিয়া গেলেন।

চারিদিক নিস্তব্ধ আর কোন সাড়া শব্দ নবদুর্গার কানে গেলনা, কেবল রান্নাঘরের ভিতর হইতে কর্কশ কণ্ঠে বামুনঠাকরুণ বলিয়া উঠিলেন—"কিগো আকাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? হাত কি কারও কাটে না ? একটুখানি আঙুল কেটেচে বলে কাজ কর্ম্ম ছেড়ে সত্যিই বসে থাকবে নাকি ?" তাড়াতাড়ি কড়াইশুঁটিগুলো ছাড়া-ইয়া দিতে বলিয়া নবদুর্গার প্রতি বিরক্তিপ্রকাশ করিতে করিতে বামুনঠাকুরুণ আবার রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

বামুনঠাকুরুণের সকল কথা নবদুর্গার কানে গেল না। তাহার মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, তাহার অন্তরে কেবল প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল—শক্ত, রোগটা শক্ত, বেড়ে যায়—এক বেলায় বাড়ে!

"ঐ ত সিঁড়ী"—নবদুর্গা ভাবিল—"ঐ ত সিঁড়ী, উঠি না কেন?" সাহস করিয়া দুটি সিঁড়ী পার হইতে পারিলেই ত্রিতলে সতুর শয়নকক্ষ। ঘরের মধ্যে সম্মুখের পালঙ্কে সতু তাহার জননীর কাছে শয়ন করিয়া আছে, না জানি কি অসুখ, কি অবস্থায় সে এখন আছে! নবদুর্গার ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার সে ছুটিয়া গিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সতুকে দেখিয়া আসে। এক এক পা করিয়া সিঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইল, দুই এক সিঁড়ী উঠিল—কর্ত্তা গৃহিণীর গোপন আদেশ নবদুর্গার স্মরণ হইল, স্মরণ হইল, চির-দিনের জন্য এ ভবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন সে আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি! নবদুর্গা শিহরিল, তাহার সাহসে কুলা-ইল না, সে ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কড়াই-শুঁটী ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। ঠিক সেই সময়ে গৃহিণীর প্রধানা পরিচারিকা বিন্দু একটা দম্‌কা বাতাসের মত বেগে রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া ত্বরিত বচনে বলিল—

"ওগো ও বামুনঠাকুরুণ তোমার ও সব রান্না বান্না ফেলে রাখ, গরম জল চড়াও গরম জল—ফোমেণ্টো হবে ফোমেণ্টো, খোকাবাবুর বড় ব্যামো—এখনি ডাক্তার এয়েছিলেন, তুমি জল চড়াও, খুব ফুটন্ত জল চাই। আমি বাইরে নিধেকে বলে আসি, একটা লোয়ার উনুন আর কাট কয়লা আমায় তেতলায় দিয়ে আসে।"

বামুনঠাকরুণ বলিলেন—"বড় ব্যামো কার? কি ব্যামো? ওলো বিন্দো কি ব্যামো ভাল করে বলে যা"—বলিতে বলিতে বিন্দুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, বিন্দু আর থামিল না, বামুনঠাকরুণের কথার উত্তর দিতে দিতেই দ্রুতপদে বাহিরে গেল। ফোমেণ্টের জল গরম হইতে যে সময়টুকু লাগিবে, সেই সময়ের মধ্যে স্থিরভাবে সকল কথা বলা এবং নিধেকে উনান ও কাঠ কয়লা আনিতে হুকুম করা অসম্ভব না হইলেও গৃহিণীর প্রধানা পরিচারিকা বিন্দুবাসিনী যে খোকা বাবুর ব্যায়রামে নিতান্তই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই কথাটা বাড়ীর সকলকে জানানই, আলস্যের বাদসা বিন্দুদাসীর এই হাঁকডাক ও ব্যস্ততার কারণ।

বিন্দু বলিল—"খোকাবাবুর, খোকাবাবুর—আমাদের রাজাবাবুর ব্যামো। নিমনিয়ে—আর ঐ যে কি বল্লেন ডাক্তারবাবু ব্যাঙ্কাইটি না কি? আহা পরশু সকালেও

বাছা ভাল ছিল গো, দেক্‌তে দেক্‌তে রোগটা হয়ে পড়্‌ল!”

নবদুর্গা উৎকর্ণ হইয়াছিল, দূর হইলেও কথাগুলা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, দেহের সর্ব্বস্থানের রক্ত যেন বক্ষে আসিয়া জমাট বাঁধিল। হায় হায়! ঠিক এমনি দিনে, কাল পৌষ মাসের ঠিক এমনি শীতে ঐ কাল নিউমনিয়া রোগই ত তাহার স্বামীকে লইয়াছে! আবার, আবার সেই!—নবদুর্গার জিহ্বা ওষ্ঠ শুষ্ক হইল, নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া অস্পষ্ট জড়িতস্বরে নবদুর্গা ডাকিল—“ভগবান্!”

গৃহের বাহিরে আসিতেই মনে হইল, অন্ধকারে কে যেন সরিয়া গেল। পঙ্কজিনী বিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন—“বিন্দী ও বিন্দী! দেখ্ তো ওপরে কে এয়েচে, মনে হ’ল কে যেন সরে গেল?” বিন্দুবাসিনীর নয়নে নিদ্রাদেবী তখন অচলা হইয়া বসিয়াছেন, পাঁচ সাত ডাকেও তাহার সাড়া মিলিল না, সে যেমন ছিল—বৃহৎ লেপের তলে তেমনি আপাদমস্তক আবৃত হইয়া পড়িয়া রহিল; কর্ত্রীঠাকুরাণীর ডাকাডাকি ঠেলাঠেলিতেও তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। নাসিকা-ধ্বনি না থাকিলে, সে জীবিত কি মৃত তাহাও বুঝি জানিবার উপায় ছিল না!

বিন্দু যখন উঠিল না, পঙ্কজিনী নিজেই সাহসে ভর করিয়া আলো হাতে লইয়া ঘর ও বাহিরের চতুর্দ্দিকে একবার দেখিয়া লইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; কাহারও কথার শব্দ শুনিলেন না। কেবল যেদিকে যান তাহার বিপরীত দিকে যেন পদশব্দ,—শেষে মনে হইল সে শব্দ সিঁড়ির দিকে গেল। কে যেন দ্রুত অথচ সতর্কতার সহিত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। পঙ্কজিনী একা দ্বিতলে নামিতে সাহস না করিয়া ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কেমন একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল।

পরদিন ঠিক ঐরূপ মনে হইল, কিন্তু লোক দেখিতে পাওয়া গেল না। প্রভাতে সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, কেহই কিছু বলিতে পারিল না। রাত্রিতে বিন্দুকে ডাকিয়া পঙ্কজিনী বলিয়াদিলেন—"আজ একটু সজাগ থাক্‌বি, ডাক্‌লে উঠে আমার সঙ্গে চারিদিক্ দেখবি, একলা আমার ভয় করে।" বিন্দু উত্তর করিল— "কেন মা আমি তো সজাগই থাকি, তুমি ডাকলেই উঠি, চুপি চুপি ডাকলে কি ঘুমন্ত মানুষ শুনতে পায়?"

পঙ্কজিনী অপেক্ষাকৃত রুষ্টস্বরে বলিলেন—"চুপি চুপি ডাকি বৈকি? ওকে বলে সজাগ ঘুম! পোড়ারমুখী যেন

মরে ঘুমোয়!” বিন্দু বলিল—“না গো না, আজ খুব সজাগ থাকবো, একটু জোরে ডেকো।” পঙ্কজিনী বলিলেন—“শুধু জোরে ডাকা নয়, ঘুম না ভাঙলে আজ তোর পিটে ঠেঙা লাঠি ভেঙে ওঠাবো।”

বিন্দু সেদিন সজাগ হইয়া রহিল। গৃহিণী নিদ্রাহীন-চক্ষে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, কিন্তু সে রাত্রিতে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। ত্রিতলের কোনও স্থানে কাহারও আগমন অনুভূত হইল না। পরদিনও সেইরূপ একবার একটু সন্দেহ হইয়াছিল কিন্তু সে কিছু নয়। আলো হাতে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিন্দু বিরক্ত হইয়া স্বস্থানে আসিয়া শয়ন করিল।

দুই একদিন ছাড়া প্রায় প্রত্যহই এইরূপ মনে হইতে লাগিল, কিন্তু অনুসন্ধানে কোনো ফল হইল না! গৃহিণার কথা অনুসারে বিন্দু দুই চারিদিন তাঁহার সহিত জাগিয়া বসিয়া রাত কাটাইল, তারপর আর বড় ও বিষয়ে মন দিল না। স্বয়ং কর্ত্তা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—“ও কিছু নয় গো কিছু নয়, তা নইলে কেউ কিছু দেখে না শোনে না, তুমিই কেবল শব্দ পাও? রাত জেগে জেগে তোমার ও একটা বাই হয়েছে। বল্লুম পারবে না, তোমার অত কষ্ট সহ্য হবে না, একজন

নার্স রেখে দিই, তাও তো দিলে না, ছেলের শুশ্রূষার ভার আর কারও হাতে দিয়েও তো বিশ্বাস নেই!"

গৃহিণী বলিলেন,—"না গো না ঠাট্টা নয়, সত্যিই শুন্‌তে পাই। কাকেও দেখতে পাই নে, কিন্তু মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ পাই, কে যেন সরে গেল মনে হয়। আচ্ছা বেশ, তুমিই এই ঘরে থেকো—আমার যখন সন্দেহ হবে তোমাকেও শোনাব।" কর্ত্তা একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া নীরব রহিলেন, পঙ্কজিনী চিন্তিত মনে ছেলের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার রাত্রি—গভীর নিশীথ। ঘর দ্বার ছাদ প্রাঙ্গন বিমল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত,—ধীরে ধীরে শীতের শীতল বায়ু প্রবাহিত,—সুবৃহৎ মজুমদার-ভবন নীরব নিস্তব্ধ,—অন্দর-বাহিরে সকলে গভীর নিদ্রায় অচেতন। ছাদের সম্মুখে বারান্দার দিকের বড় ঘরে পালঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় রোগক্লিষ্ট রাজেন শায়িত, দূরে বাতি-দানে বাতি জ্বলিতেছে, চারি কোণে চারিখানি টেবিল, রোগীর ঔষধ পথ্য ও নানা আবশ্যকীয় দ্রব্যে পূর্ণ। পালঙ্কের নিকটে টিপায়ে ফুটন্ত ফুলের দুইটি গুচ্ছ, তাহাতে নানা জাতীয় গোলাপের সুগন্ধে টার্পিন্ লিনিমেণ্ট্ প্রভৃতির গন্ধের তীব্রতা হ্রাস করিতেছে। অল্পক্ষণ বিশ্রামের জন্য পুত্রের নিকট দাসীকে বসাইয়া রাজেন্দ্রের জননী পালঙ্ক হইতে একটু দূরে একখানা আরাম-কেদারায় শয়নমাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। দাসী রাজেন্দ্রের মস্তকে ধীরে ধীরে বাতাস করিবার উপদেশ পাইয়া পাখা-হস্তে মস্তকের নিকট বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে অবশেষে ভূমিশয্যায় পড়িয়া ঘুমাইয়াছে, চতু-

দিকের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্র্যাকেটের উপর ক্লকটা কেবল টিক্ টিক্ শব্দে অবিরাম চলিতেছে।

অতি ধীরে, অত্যন্ত সর্কতার সহিত পশ্চাতে বারান্দার দিকের ক্ষুদ্র দ্বারটি খুলিয়া নবদুর্গা শয্যার উপর রাজেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। বাতির আলোকে উজ্জ্বল গৃহে মশারি ও লেপ বালিশের অন্তরালে বসিয়া অঞ্চল হইতে দেবতার নির্ম্মাল্য খুলিয়া রাজেন্দ্রের ললাটে স্পর্শ করাইয়া উর্দ্ধমুখে যুক্তকরে নীরবে কি প্রার্থনা করিল, তারপর আত্মগোপন চেষ্টায় বাতির আলো যথাসম্ভব অনুজ্জ্বল করিয়া সেই স্বল্পালোকে তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব সতুর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অতি ধীরে অতি সাবধানে বাতাস করিতে করিতে তাহার জ্বরতপ্ত দেহের উপর জননী-হৃদয়ের অনন্ত শুভ ইচ্ছার সহিত স্নেহহস্ত বুলাইতে লাগিল।

রোগের ঘোরে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া রাজেন ডাকিল —'মা'—'মা'। সে ধ্বনি নিদ্রিত পঙ্কজিনীর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই ত্রস্তে-ব্যস্তে পীড়িতের মুখের কাছে অবনতা হইয়া নবদুর্গা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা?"

মুদ্রিতনয়নে রাজেন্দ্র উত্তর করিল—"জল, মা—বড় কষ্ট"—নবদুর্গা অতি সাবধানে উঠিয়া টেবিলের উপর

হইতে সোডার জল আনিয়া খাওয়াইল, রোগী তৃপ্তিবোধ করিয়া বলিল—"আঃ।"

নবদুর্গার সযত্ন শুশ্রূষায় রোগের কষ্টের মধ্যেও রাজেন্দ্র ঘুমাইতে লাগিল। দিবারাত্রি একা অনবরত পীড়িত পুত্রের শুশ্রূষায় ক্লান্ত পঙ্কজিনা, আর প্রভুপত্নীর মনোরঞ্জন-হেতু প্রভু-পুত্রের প্রতি মমতা প্রদর্শন-তৎপরা পরিচারিকা উভয়েরই কিছুক্ষণ নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

রাজেন্দ্র হাতটি নাড়ে, পাটি সরায়, মাঝে মাঝে উঃ আঃ করে, আর নবদুর্গা শিহরিয়া উঠে—ঐ বুঝি পঙ্কজিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, ঐ বুঝি আসিয়া পড়ে! নবদুর্গা আরো প্রাণপণে তাহার সতুর রোগ-যাতনা দূর করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করে, আর সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—হে দেব দয়াময়! সতুর সকল রোগ বালাই, কষ্ট যন্ত্রণা আমায় দাও, সতুকে আমার সুস্থ কর, নীরোগ কর, বাঁচাও, রক্ষা কর!

প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, নিস্তব্ধ গৃহ প্রতি-ধ্বনিত করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিল, পঙ্কজিনীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—একি বাতিটা যে একেবারে নিবে যাবার মত হয়েচে! আঃ একটু চোখ বুজিছি, মাগী এইটুকু সময় আর

রাজেনকে আমার দেখতে পারেনি, ঘুমিয়েচে! কর্ত্তা আবার বলেন একজন নার্স রেখে দিই, সে তোমার রাজেনের সেবা করবে, তারা তোমার চেয়ে আরও ভাল সেবা জানে। জানবে না কেন, মাইনে করা লোক জানে সবই, ভাল করে' করে কই?

আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া ফিরিয়াছেন, এমন সময় পঙ্কজিনীর মনে হইল বারান্দার দিকের দ্বারটা যেন একটু নড়িল! কেন? কেউ ঘর থেকে বাহির হয়ে গেল নাকি? পঙ্কজিনীর মনে সন্দেহ জাগিল। দাসীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া সঙ্গে লইবার দেরী সহিল না। গৃহের বাহিরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোক—ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া পঙ্কজিনী একাই ত্বরিতপদে গৃহের বাহিরে আসিলেন। উজ্বল জ্যোৎস্নায় তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, কে একটি স্ত্রীলোক দ্রুত ছাদ পার হইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছে।

স্ত্রীলোক?—স্পষ্ট দেখিলেন—স্ত্রীলোক! তবে অন্যের সাহায্যের আবশ্যক কি? রুদ্ধনিশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া পঙ্কজিনী স্ত্রীলোকটির কাপড় টানিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। নিরুপায় নবদুর্গা কম্পিতদেহে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কর্ত্রীর চরণ-প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

পঙ্কজিনী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—“কি? নবদুর্গা তুই?

তোর এই কাজ? এত সাহস তোর? শুধু আজ নয়, তবে রোজই তুই চোরের মত আমার রাজেনের কাছে এসে বসে থাকিস্! তাই রোজ আমি পায়ের শব্দ শুনি! মিথ্যুক্, তোর এক কথা আর কাজ! কি প্রতিজ্ঞা করেছিলি মনে নেই?"

ধীর মন্থরগতি অশ্ব যেমন চালকের উপর্য্যুপরি কশাঘাতে উদ্ধত অসহিষ্ণু হইয়া লাফাইয়া উঠে, নবদুর্গা তেমনি অসহিষ্ণু হইয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল! তাহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ওষ্ঠ কম্পিত হইল, দৃঢ়স্বরে সতুর মা উত্তর করিল,—"হাঁ, আমি। দিনে দেখবার হুকুম পাই নে বলে রোজ রাত্রে লুকিয়ে চোরের মত এসে আমি আমার সতুকে দেখে ঠাকুরের মালা তার কপালে ছুঁইয়ে যাই! দিদিঠাকরুণ, আর কেহ নয় আমিই সই দুঃখিনী—যথার্থই এ অসীম জগতে এ বিপুল বিশ্বে আমি নিতান্তই ভাগ্যহীনা, দুঃখিনী। দুঃখিনী—কিন্তু মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসিনী নই।" ক্ষুব্ধা মর্ম্মাহতা নবদুর্গার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। মর্ম্মব্যথা অশ্রুবিন্দুতে পরিণত হইয়া মাটিতে মিশিল।

অপ্রতিভ হইয়া পঙ্কজিনী বলিলেন—"রাগ কোরো না সতুর মা, আমি বুঝতে পারি নি। দেখ, তোমার উপরে

আসায়, সতুর সঙ্গে কথা কওয়ায় আমার আর কোনো আপত্তি নেই, কেবল”—নিতান্ত কোমল করুণকণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিলেন—“তোমায় আর কি বোলবো নবদুর্গা সকলি তো তুমি জান? আচ্ছা কাল থেকে যখন ইচ্ছা তুমি উপরে এসো সতুর সঙ্গে কথা বোলো, কেবল মনে রেখো, সতু যেন না জানতে পারে তুমি—”

পঙ্কজিনীর কথায় বাধা দিয়া নবদুর্গা ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল—“ভয় নেই দিদিঠাকরুণ, মনে সে ভয় সে ভাবনা রাখবেন না, এমন অধর্ম্ম আমা হতে হবে না, যা প্রতিজ্ঞা করেছি প্রাণ দিয়ে তা পালন কোরবো। সতু আপনার, চিরদিন আপনারই থাকবে, আমি তার কাছ থেকে কোনো কিছুরই আশা রাখবো না, কেবল—।” নবদুর্গা সহসা পঙ্কজিনীর পদদ্বয় উভয় হস্তে বেষ্টন করিয়া অনুনয়স্বরে বলিল—“আর কিছু নয় কেবল সতুকে সাধ মিটিয়ে দেখতে, তার কাছে থাকতে দেবেন, দয়া করে আমায় সতুর কাছ থেকে কোনো দিন দূরে সরাবেন না; আর সতুকে যে নামই দিন আমার মরণ পর্য্যন্ত সকলে আমাকে সতুর মা বলেই ডাকবেন।”

নবদুর্গা নীরব হইল—অনাথার অশ্রুবারি নীরবে সৌভাগ্যবতীর চরণ ধৌত করিতে লাগিল।

পরদিন হইতে নবদুর্গার দুঃখ না ঘুচিলেও তাহার জীবন-যাত্রার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইল। তাহার গণ্ডী-ঘেরা কর্ম্মক্ষেত্রটুকু বিস্তৃত আকার ধারণ করিল! দুঃখিনীর দুঃখের রাতে বুঝি সুখের জ্যোৎস্না উঁকি দিল।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, দেবতার বরে ক্রমে সতু তাহার রোগমুক্ত সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন, মাস, বৎসর, দশ বৎসর কাটিল। ক্রমে সতু তাহার রূপে গুণে জ্ঞানে সম্মানে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। নবদুর্গার, মজুমদার-দম্পতির হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল! মজুমদার-দম্পতির সে আনন্দ, হাস্যে মুখর, গর্ব্বে দীপ্ত, বাসনায় অতৃপ্ত! নবদুর্গার সে হর্ষ, অশ্রুতে স্নিগ্ধ, কৃতজ্ঞতায় নির্ম্মল, তৃপ্তিতে মধুর!

যথাসময়ে রাজেন্দ্রের বিবাহ হইল। পুত্রের অনুরূপ লাবণ্যময়ী নববধু আসিয়া মজুমদার-ভবন উজ্জ্বল করিল।

নবদম্পতি মজুমদার-গৃহিণীর চরণ বন্দনা করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া স্মিতমুখে গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বারের পার্শ্বে পাচিকা পরিচারিকা ও বাহিরের পাঁচজনের সহিত দাঁড়াইয়া নবদুর্গা সে আনন্দ দৃশ্য দেখিয়া অন্তরে অপূর্ব্ব পুলকস্পন্দন অনুভব করিল! জগদীশ্বর-চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া বার বার—শত

সত্তুর মা।

সহস্রবার অনিমিষ অতৃপ্ত-নয়নে সে মুখ-ইন্দু নিরীক্ষণ করিল।

রাজেন্দ্রের ন্যায় বধূমাতা রতনবালাও নবদুর্গাকে একজন দাসী বলিয়াই চিনিয়া রাখিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজেন্দ্র এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ধনীর গৃহিণী—ম্যাজিষ্ট্রেটের জননী পঙ্কজিনী, তাঁহার সুখের সীমা—ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট, সুখ নিরবচ্ছিন্ন, গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ। সকল সৌভাগ্য লাভ করিয়া মনের সাধে পঙ্কজিনী সংসারে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। আর নবদুর্গা আত্মগোপন করিয়া নিতান্ত দীনভাবে দাসী-মহলে দাসীরূপে দিনাতিপাত করিতে লাগিল!

কিন্তু হায়! পঙ্কজিনীর এত সাবধানতা সতর্কতা সকলি বৃথা হইল! এত সুখ বেশী দিন তাঁহার ভাগ্যে সহিল না! রাজেন্দ্রের বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যু হইল। পঙ্কজিনীর সকল আশা ভরসা আনন্দ যেন সেই সঙ্গেই অন্তর্হিত হইল। স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শোকের তীব্রতার মধ্যেই পঙ্কজিনী আপন বর্ত্তমান অবস্থা ও নবদুর্গার প্রতি নিজের সুদীর্ঘ কালের অনুচিত আচরণ স্মরণ করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এখন? এখন যদি নবদুর্গা সেই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লয়?

নবদুর্গার প্রতি কতদিনের কত নির্ম্মম ব্যবহার এক সময় যাহা উচিত ভাবিয়াই করিয়াছিলেন আজ একে একে সেই সকল স্মরণ করিয়া পঙ্কজিনী মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিলেন! তাইত, এখন যে নবদুর্গার প্রতিশোধ লইবার স্বর্ণ সুযোগ! একটি—এখন একটি মাত্র গোপন কথা তাঁহার রাজেনকে—তাঁহার প্রাণের প্রাণ নয়নের মণি আনন্দ আশা—তাঁহার ইহ জীবনের একমাত্র সম্বল রাজেনকে যদি নবদুর্গা বলিয়া দেয়,—"পঙ্কজিনী তোমার—পঙ্কজিনীর গর্ভে তুমি—"

ওঃ! পঙ্কজিনী আর পারিলেন না। এ চিন্তা তাঁহার অসহনীয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ-প্রায় হইল চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার মনে হইল—"না দেরি নয়, এখনই এর উপায় করিতে না পারিলে সত্য প্রকাশ পাইবে, পুত্র আপন গর্ভ-ধারিণীকে চিনিয়া লইবে, কাঙালিনী রাজ-জননী হইবে, পতি-পুত্রহীনা দুর্ভাগ্য আমি অসহ্য কষ্টে নীরবে কর্ম্মফল ভোগ করিব! হায়, এই কি আমার নিয়তি! এই কি বিধিলিপি! না, কখনই না!" পঙ্কজিনী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—দিবসের নিরূপিত কর্ম্মগুলির অবসানে রান্নাঘরের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ঘরখানিতে, যেখানে নবদুর্গা ভূমি-

শয্যায় বিশ্রাম করিতেছিল—দ্রুতপদে সেখানে উপস্থিত হইয়া উন্মত্তার মত তাহার পদদ্বয় উভয় হস্তে বেষ্টন করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিলেন—"ক্ষমা কর বোন্, আজ আমায় ক্ষমা কর, আমার সকল অপরাধ সমস্ত দুর্ব্যবহার ভুলে যাও!"

নবদুর্গা এই অসম্ভাবিত ঘটনায় অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া ত্রস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া পঙ্কজিনীর হস্ত হইতে আপন চরণ মুক্ত করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একি! দিদিঠাকরুণ, একি! হয়েচে কি?" পঙ্কজিনী উত্তর দিবেন কি, আশঙ্কা উদ্বেগ ও অনুতাপে আজ তাঁহার হৃদয় কাণায় কাণায় পূর্ণ। অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন হৃদয়ভাব প্রকাশ করিবার এখন আর তাঁহার সামর্থ্য কোথায়?

নবদুর্গা আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরাধিক পঙ্কজিনীর সহিত একগৃহে বাস করিতেছে, কিন্তু, তাঁহার এ ভাব কখনও দেখে নাই। আজ সে তাহার ধনগর্ব্বিতা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহসা এই ভাবান্তর দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত—অসম্ভব হইলেও, নবদুর্গার মনে হইল বুঝি বা তাহার সতুরই কোনো অমঙ্গল ঘটিয়াছে।

. কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া পঙ্কজিনী যখন নবদুর্গার ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে ধীরে ধীরে আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া আবার ক্ষমা প্রার্থনার উপক্রম করিলেন, নবদুর্গা তখন প্রকৃতই ভগ্নীস্নেহে পঙ্কজিনীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া সানন্দচিত্তে সহাস্যমুখে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিল—"সতু আমার নয়—তোমার, চিরদিনই তোমার, তুমিই সতুর মা, আমি কেবল তোমার দাসী মাত্র, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার বড় আশার, বড় সাধের রাজেনকে নিয়ে তুমি সুখী হও; তোমার এক বোউ-বেটা এক শো হোক্, নাতি নাতনীতে তোমার সুখের সংসার পূর্ণ হো'ক! আর কিছুই আশা আকাঙ্ক্ষা আমার নেই, কেবল আশীর্ব্বাদ কর যেন সতুর মুখ দেখতে দেখতে মরতে পাই।"

আপনার প্রকৃতি দিয়া মানুষ অন্যের বিচার করে। অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া সে অন্যের হৃদয় চিনিবার ভ্রমে পড়ে, তাই এত বৎসর এক স্থানে এক সংসারে থাকিয়াও—পঙ্কজিনী নবদুর্গাকে চিনিতে পারেন নাই; তাহার অন্তরের প্রকৃত পরিচয় পান নাই। তিনি নবদুর্গার প্রতি নিজের দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে ভ্রমেও এ ব্যবহার আশা করেন নাই।

আজ বিস্মিত স্তম্ভিত মুগ্ধচিত্তে নবদুর্গাকে বলিলেন—"না দিদি না, দাসী নও তুমি আজ থেকে আমার দিদি, আমার বোন্, আমি তোমার ছোট বোন্, রাজেন আমার বড় বোনের স্নেহের দান। তোমার আশীর্ব্বাদেই আজ আমি রাজেনকে নিয়ে সুখী, এ সুখে—এ সুখের সংসারে তোমার আমার সমান অধিকার, রাজেনকে যেভাবে দেখে শুনে যত্ন করে তৃপ্তি পাও, তাই কর, কোনো বাধা দেব না—ভয় ভাবনা রাখবো না। চল দিদি চল, আজ থেকে এ ঘর ছেড়ে আমার তেতলার ঘরে থাকবে চল; দুজনের যদি তুল্য অধিকার, তবে একজনের তেতলার ঘরে রূপার পালঙ্কে মখমলের বিছানায়, আর একজনের একতলায় মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাকা মানায় না।"

নবদুর্গার মুখে আনন্দের হাস্যজ্যোতিঃ, নয়নে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল! তাহার কৃতজ্ঞ অন্তর বিভুপাদপদ্মে নত হইয়া বলিল—"হে প্রভু, করুণাময়, তোমারই এ দান; দুঃখিনীর দুঃখমোচনে তোমারই এ কৌশল! ধন্য পিতা, ধন্য তুমি! তোমার মহিমা অনন্ত! করুণা অসীম!

পঙ্কজিনীর আগ্রহ সত্ত্বেও নবদুর্গা তাহার বাস-গৃহখানি ত্যাগ করিয়া ত্রিতলে গমনের ব্যবস্থা করিল না। হঠাৎ

এতটা বাড়াবাড়িতে অপর দাস-দাসীদের মনে, এমন কি স্বয়ং রাজেন্দ্রের মনেও সন্দেহ জাগিতে পারে, এ কথা পঙ্কজিনীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলে তিনি নিরস্ত হইলেন ; তবে রাজেন্দ্রকে দেখিবার তাহার নিকটে যাইবার, সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় তাহার যত্ন-শুশ্রূষা করিবার আর কোনো বিধি নিষেধ রহিল না।

নবদুর্গার হৃদয়ের ভার যেন একটু একটু করিয়া লঘু হইতে লাগিল ! তাহার চিরবিষণ্ণ মুখ আনন্দের রেখাপাতে উজ্জ্বল হইল, নয়নের কালিমা ঘুচিয়া একটা দীপ্তি প্রকাশিত হইল ! আনন্দ-উৎসাহে তাহার গত বিশ বৎসর পূর্ব্বের সামর্থ্য আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। পতি-বিয়োগ-কাতরা নারীদ্বয় পুত্রমুখ চাহিয়া শোক তাপ ভুলিয়া সুখী হইল।

কিন্তু নিরন্তর সুখ ভোগ করিতে দেওয়া বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয় ! এক ভাবে একটানা স্রোতে সংসার-তরণী বুঝি চলে না—চলিতে পারে না। পঙ্কজিনী ভাবিয়াছিলেন, এমনি ভাবেই বুঝি তাঁহার দিন কাটিবে,—এ সুখের এ জীবনের বুঝি শীঘ্র অবসান হইবে না। কিন্তু তাহা হইল না ! পরিপূর্ণ সুখের মাঝে সহসা পঙ্কজিনীর ভরা-ডুবি হইল। রাজেন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র পূর্ণচন্দ্রের জন্মের

তিন সপ্তাহ পরে হঠাৎ প্লেগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পঙ্কজিনীর মৃত্যু হইল। এত যত্নের—এত সাধের সংসারের কাছে একবার বিদায় লইবার পর্য্যন্ত অবসরও তাঁহার মিলিল না! বড় তাড়াতাড়ি পঙ্কজিনীকে যাইতে হইল।

পঙ্কজিনীর মৃত্যুর সময় রাজেন্দ্রের বড় খোকার বয়স পাঁচ বৎসর, কন্যাটির তিন। তাহারা দুটি ভ্রাতা ভগিনী তাহাদের ঠাকুরমার সহসা অন্তর্দ্ধানে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। নবদুর্গা সস্নেহে রোরুদ্যমান শিশু দুটিকে আপন বক্ষে তুলিয়া লইল—আদরে সোহাগে স্নেহে যত্নে তাহাদের ঠাকুরমার অভাব ভুলাইয়া দিল।

দুটিতে সতুর মায়ের অঞ্চলের নিধি হইল। আশৈশব পিতা মাতার অত্যধিক স্নেহ-যত্নে প্রতিপালিত রাজেন্দ্র জনক-জননীর অভাবে বড়ই দুঃখ অনুভব করিলেন। বধূ জননীসমা শ্বশ্রূর বিয়োগে মর্ম্মাহত হইলেন। সে গভীর শোকে নবদুর্গা উভয়কে সান্ত্বনা দিল। অল্পে অল্পে তাঁহা-দেরও যত্নের ভার সে নিজের হাতে লইল। নবদুর্গার স্নেহ যত্নের মধ্যে মাতৃস্নেহের বিকাশ দেখিয়া উভয়ে তৃপ্তিবোধ করিলেন। সতুর মায়ের স্নেহ যত্নে—সতুর মায়ের কর্ম্ম-দক্ষতায়, সতুর মায়ের তৎপরতায় অল্পে অল্পে পঙ্কজিনীর শূন্য স্থান যেন ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিতে

লাগিল। পঙ্কজিনীর স্মৃতি যেন সতুর মায়ের মাঝে শ্রান্ত-দেহে আশ্রয় লইল। পঙ্কজিনীর নাম লুপ্তপ্রায় হইল। সারা সংসারটি ব্যাপিয়া রহিল কেবল—সতুর মা। সংসারের সকল অন্তরগুলি ব্যাপিয়া রহিল কেবল—সতুর মায়ের অতুল স্নেহ। কিন্তু এ ভাবে বেশী দিন কাটিল না, নবদুর্গার ভাগ্যে দুদিনের সুখ দুদিনেই ফুরাইল। সতুর মা যে তিমিরে ছিল আবার সেই তিমিরেই আসিয়া পড়িল।

একবার প্রসবের পর সূতিকাগৃহে বধূমাতা রতনবালার মরণাপন্ন পীড়ার সময়ে কন্যার যত্ন-শুশ্রূষা করিতে আসিয়া রাজেন্দ্রের শাশুড়ী সংসারের কর্তৃত্ব এবং কন্যা জামাতা ও নাতি নাতিনীগুলির যত্নের ভার নিজে লইয়া নবদুর্গাকে অব্যাহতি দিলেন। সতুর মায়ের হস্ত হইতে একে একে সকল অধিকার রাজেন্দ্রের শাশুড়ীর হস্তে গেল। ধীরে ধীরে বৎসর কয়েকের মধ্যেই রাজেন্দ্রের শাশুড়ী এই সংসারের প্রকৃত গৃহিণী, যথার্থ শুভানুধ্যায়িনী হইয়া উঠিলেন। আর সতুর মার দুরদৃষ্ট সতুর মাকে আবার তাহার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিল। কেবল দীর্ঘকালের অধীনতার পর স্বাধীনতাটুকু পাইয়া তাহার অন্তরের যে মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা আর গেল না।

তাহার বহু আয়াসলব্ধ পূর্ব্ব অভ্যাস আর ফিরিল না। সতুর মা পঙ্কজিনীর নিকট যেমন পারিয়াছিল রাজেন্দ্রের শাশুড়ীর নিকট ততটা অধীনতা স্বীকার করিতে পারিল না। পঙ্কজিনীর আদেশ নিষেধ বিধি ব্যবস্থা যে ভাবে মান্য করিয়া চলিয়াছিল, রাজেন্দ্রের শাশুড়ীর নিষেধ আজ্ঞা বিধি ব্যবস্থা সেরূপ ভাবে মানিয়া চলিতে পারিল না। দুঃখ অভিমান ও আত্মসম্মান-বোধে জলাঞ্জলি দিয়া অন্যান্য দাস দাসীর অনুকরণে তোষামোদাদি দ্বারা নবগৃহিণীর প্রিয় হইতে পারিল না। ফলে প্রথম হইতেই উভয়ের মধ্যে অপ্রীতির ভাব বদ্ধমূল হইয়া ক্রমে রাজেন্দ্রের শাশুড়ীর রোষদৃষ্টি কুগ্রহের ন্যায় শত দিক্ হইতে শত প্রকারে সতুর মায়ের অনিষ্ট সাধন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

সতুর মা শান্তি হারাইল, স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিল, কিন্তু ভয়ে ভীত হইয়া আপন কর্ত্তব্য ভুলিল না, অসহিষ্ণু হইল না! ভগবৎ চরণে মতি স্থির রাখিয়া নীরবে সে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিল। জননীর শিক্ষা-ক্রমে বধূমাতার ব্যবহার অসহ্যপ্রায় হইলে অন্যের অলক্ষ্যে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া সতুর মা ভাবিল—"দোষ কারও নয় গো মা, আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

অভাবের দিনে সতুর মায়ের স্নেহাশ্রয়, সংসার-পরি-

চালনায় সতুর মায়ের বিবেচনা বুদ্ধির সহায়তা, রাজেন্দ্র বধূমাতা হইতে নব প্রসূত শিশুটির পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল বটে কিন্তু সে অভাবের দিন কাটিয়াছে—সে প্রয়োজন ঘুচিয়াছে, সুতরাং কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে সকলে সতুর মায়ের স্নেহাশ্রয় করিয়া শান্তি তৃপ্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ সেই ভবনে একটি বৃদ্ধ ও একটি বালিকা ব্যতীত সতুর মায়ের ব্যথার ব্যথী আর কেহ জুটিল না।

মজুমদার-পরিবারের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয় ও রাজেন্দ্রের স্নেহময়ী বালিকা কন্যা সন্তোষিনী। সতুর মাকে সকলেই ভুলিয়াছে, কেবল এই বালিকাই ভুলে নাই, একমাত্র সে-ই সতুর মায়ের অগাধ স্নেহ উপেক্ষা করিয়া 'দিদিমায়ের' অঞ্চলে বাঁধা থাকিতে পারে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজেন্দ্রের কন্যার বিবাহ—বিপুল সমারোহ—অসীম আনন্দ! একা নবদুর্গা আজ যেন দশভূজারূপে দশদিকের তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছে। মুহূর্ত্ত তাহার কর্ম্মের বিরাম নাই, শ্রান্তিবোধের অবসর নাই, উৎসাহ উল্লাসের অন্ত নাই। পুঁটুরাণীর—তাহার আদরের সন্তোষিণীর বিবাহ উৎসবে আজ সে তাহার প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে, দুঃখ অভিমান মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে। আজ যে তাহার জীবনের স্মরণীয় দিন, তাহার সতুর আনন্দের কাজ সতুর মেয়ের বিবাহ; সতুর মান সম্ভ্রম রক্ষা করা, নিমন্ত্রিতগণের আহ্বান আপ্যায়ণ, যত্ন পরিচর্য্যা করা আজ যে তাহারই কাজ। আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া সে কি আজ তাহার তুচ্ছ বিবাদ বিষাদ মান অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? বিবাহ বাড়ির কর্ম্ম সকল তাহারই ইঙ্গিতে তাহারই পরামর্শে সুসম্পন্ন হইতেছে;—মনে হইতেছে সেই যেন সংসারের কর্ত্রী, সেই আজ গৃহের প্রকৃত গৃহিণী, আর সকলে তাহারই অধীনে তাহার হুকুম তামিল করিয়া ফিরিতেছে মাত্র। সামান্য দাসীটি হইতে

বধূমাতা রতনবালা পর্য্যন্ত আজ তাহার আজ্ঞাধীনা, স্বয়ং রাজেন্দ্র তাহার সৎপরামর্শের প্রার্থী। কর্ত্তব্যের দায়িত্ব-বোধের সহিত আনন্দের মত্ততায় সে আজ বিভোর; যেন কি এক যাদুমন্ত্রে সকলে আজ তাহার বশীভূত, তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত। এ আনন্দের দিনে শত্রুও আজ তাহার মিত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ব-কর্ম্মে তাহার অভিজ্ঞতা ও তৎপরতা দর্শনে মনে মনে পরাভব স্বীকার করিয়া রাজেন্দ্রের শাশুড়ি অন্তরে ঈর্ষা-বিষে জর্জ্জরিত হইলেও আজ তাহাকে হাসিমুখে সম্ভাষণ করিতেছেন—সম্ভ্রমসূচক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিতেছেন।

সর্ব্বোপরি সৎপ্রকৃতি বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয় আজ চির-দুখিনীকে হর্ষোৎফুল্ল দেখিয়া তাহাকে আনন্দ জ্ঞাপন ছলে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। বিবাহ সাজে সুসজ্জিতা হইয়া মাননীয়া মহিলামণ্ডলীর মাঝে অবোধ বালিকা সন্তোষিণী আজ আশৈশবের প্রীতিবশে সর্ব্বাগ্রে তাহারই চরণধূলি মস্তকে লইয়াছে—মাতামহীর নিষেধসূচক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া আনন্দাশ্রুস্নিগ্ধ শুভদৃষ্টির আহ্বানে হাস্যমুখে তাহারই স্নেহালিঙ্গনে ধরা দিয়াছে। এত সুখ এত আনন্দ বুঝি তাহার অন্তরে ধরিতেছে না। তাহার আদরিণী সন্তোষিনীকে শতবার শতরূপে দেখিয়াও বুঝি তাহার নয়ন

পরিতৃপ্ত হইতেছে না। সতুর মা আজ এই বিপুল আনন্দ বহন করিয়া কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ফিরিতেছিল—আর গৃহস্থিত ও আমন্ত্রিতবর্গ এই প্রাচীনা দাসীটির অদ্ভুত কার্য্যকুশলতা প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে দেখিতেছিল।

পুঁটুরাণীর বিবাহ—আনন্দের দিন, উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে নিম্নতম চাকর দাসীটিকে পর্য্যন্ত উপযুক্ত উপহার বা বক্‌শিশ দেওয়া হইয়াছে। সতুর মা কর্ত্তাবাবুর আমলের চিরবিশ্বস্তা বৃদ্ধা পরিচারিকা, রাজেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজেন্দ্রের ছেলে মেয়েগুলিকে পর্য্যন্ত স্নেহ যত্ন দিয়া মানুষ করিয়াছে—সুখে দুঃখে গৃহস্থের আপনার জনের মত অনুক্ষণ সাথে সাথে আছে—সাধারণ দাস দাসী অপেক্ষা তাহাকে কিছু বেশী দেওয়া উচিত। তাই তাহাকে একছড়া সোনার হার ও একখানা উৎকৃষ্ট সাদা গরদ দিবার হুকুম হইল।

বধূমাতা স্বহস্তে তাহাকে দিতে আসিলেন। শত চেষ্টাতেও নবদুর্গা হাত পাতিয়া তাহা লইতে পারিল না, তাহার হর্ষরঞ্জিত হৃদয়খানার উপর কে যেন হঠাৎ কালি ঢালিয়া দিল; শত বৃশ্চিক যেন একসঙ্গে তাহাকে দংশন করিল! আহা সে যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের গর্ভধারিণী

জননী! তাহাকে কি আজ সামান্য দাসদাসীর দলে মিশিয়া তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া নিজের নাতিনীর বিবাহে বক্‌-শিশ্‌ লইয়া একগাল হাসিয়া 'রাজাবাবুর জয় হোক' বলিতে হইবে? হা অদৃষ্ট!

বিবাহের পরদিন প্রভাতে নব বরবধূ—নবদুর্গার সাধের নাতিনা নাতিনী-জামাই, বিদায়ের কালে সর্ব্বাগ্রে তাহারই যে যৌতুক করিবার কথা।—নাতিনীর বিবাহে সকলকে যথাযোগ্য উপহার বক্‌শিশ দেওয়া যে আজ তাহারই কর্ত্তব্য। বধূ বিলম্বে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "নাও না গো, হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?"

নবদুর্গা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"না মা আমি আর ও নিয়ে কি করব, পুঁটুরাণী আমার বেঁচে থাক—সুখী হোক্—সিঁথের সিঁদুর—হাতে নোয়া বজায় থাক্ জামাই তোমার অক্ষয় অমর হোক্—বিয়ে বলে আনন্দ করে তুমি যে দিতে এয়েচ ওই আমার নেওয়া হয়েচে, আমার কাছে না রেখে, তোমার কাছেই রেখে দাও।"

রাজেন্দ্র যখন শুনিলেন—সতুর মা বকশিশ্ নেয়নি, তখন তাঁহার মনে হইল পসন্দ হয় নাই বুঝি। মাগী লোক ভাল কিন্তু কিছুতেই মন ওঠে না, ভারী অহঙ্কারী যা হোক্। গরদের থান ও মূল্যবান্ হারের সহিত

একগাছি অল্পদামী সোনার অনন্ত দিয়া একটু মৃতু ভৎসনার সহিত রাজেন্দ্র নিজ হাতে সতুর মাকে বক্‌শিশ্‌ দিলেন। সতুর-মা আর কথা কহিতে পারিল না, হৃদয় মনের সমগ্র শক্তির দ্বারা উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া কোনমতে তাহাকে হাত পাতিতে হইল কিন্তু শত চেষ্টাতেও মনিবের দেওয়া গরদ পরিয়া গলায় হার ও হাতে অনন্ত দিয়া, দাসী মহলে হাত তুলাইয়া বেড়াইতে পারিল না।

বধূর কোন প্রিয়দাসী ইসারা ইঙ্গিতে জানাইল—সতুর মাকে যা দেওয়া হয়েচে তা তার পছন্দ হয়নি, হারে পাথর বসান নয়, আর এক গাছা অনন্ত বলে সে পরেনি। সকলে রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল—না হোকগে পছন্দ, মরুক গে—ছোট লোককে হাজার দাও মন ওঠে না। পুঁটুরাণীর দিদিমা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"বল্‌গে না তোদের বাবুকে—পুরণো চাকরাণী, মেয়ের বিয়েয় যা চাইবে খুসী হয়ে তাই দেবে—চাই কি একটা রাজত্ব আধখানা রাজকন্যাও দিতে পারে।"

নবদুর্গা সকলি শুনিল, এক এক জনের এক একটি বিদ্রূপ তাহার অন্তরে শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। একবার তাহার এই হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিতে ইচ্ছা

হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওই ঠাকুর ঘরে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে তামা তুলসী গঙ্গাজল লইয়া শপথ করা তাহার মনে পড়িল, নবদুর্গা শিহরিয়া উঠিল। নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া করযোড়ে ডাকিল—"হে নারায়ণ রক্ষা কর! মধুসূদন শক্তি দাও, সহ্য করবার শক্তি দাও, যেন প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-পাপে না মজি।"

সন্তোষিণীর বিবাহের পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। যথাসময়ে একে একে সে তাহার বিবাহিত জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দের কাহিনীগুলি শুনাইয়া,—তাহার—নবকুমারের কমলমুখের অমিয় হাসি দেখাইয়া,—সরল হৃদয়ের অনাবিল ভক্তি শ্রদ্ধা উপহার দিয়া, সতুর মায়ের সংসার-তাপ-তপ্ত অবসন্ন দেহ মনে এখনও হর্ষ বিষাদ আশা আকাঙ্ক্ষাকে সচেতন রাখিয়াছে। নতুবা, সন্তোষিণীর বিবাহের পর হইতে দিনের পর দিন তাহার প্রতি গৃহস্থের, বিশেষতঃ কর্ত্রীঠাকুরাণীর অযথা অত্যাচার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে একেবারেই তাহাকে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইত। সতুর মায়ের জীবনের অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, যাহা দেখিবার এবং যাহা দেখিবার নয়, যাহা শুনিবার এবং যাহা শুনিবার নয়, এমন অনেক কিছুই সে তাহার জীবনে দেখিয়া শুনিয়া

লইয়াছে। এখন তাহার শেষ সময়, বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়াছে—তাহার দেহ মনের শক্তি হরণ করিয়াছে। জগতে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে আসিয়াছিল, চাহিবার তাহার অনেক ছিল, কিন্তু পাইবার দিনে সে চাহে নাই; ভোগের দিনে সে ত্যাগের পথ ধরিয়া চলিয়াছিল, আজ ত্যাগের দিনে সে ভোগের প্রত্যাশী হইয়া বসিয়াছে। জীবনের সংগ্রামে যুঝাযুঝি করিয়া, সে এখন ক্লান্ত অবসন্ন। তাই এখন সকলের নিকট,—চিরদিন যাহাদের সেবায় প্রাণপাত করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে একটু সেবা যত্ন—একটু আন্তরিক স্নেহ মমতা সে প্রত্যাশা করে। তাহার জীবনে হৃদয়ভরা স্নেহ সে অযাচিত ভাবে অপর্য্যাপ্তরূপে দান করিয়া আসিয়া বিশ্ববাসীর দ্বারে আজ বিন্দু স্নেহের প্রার্থী! কিন্তু কিছু না, কিছু না,—সব শূন্য, সব মিথ্যা! অজস্র যাহার কাছে লাভ করিয়াছে, তাহাকে বিন্দু দানে আজ বিশ্বজন কাতর!

সতুর মা'র জীবনের দিন যতই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছিল, তাহার কর্ম্মের শক্তি যতই লোপ পাইতেছিল, ততই সে বুঝিতেছিল—পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাহার অধিকার এ সংসারে ক্রমেই অস্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে।

যাহাকে নিকটে চাহে, কঠিন ধরার নিষ্ঠুর শাসনে সেই সতু তাহার নিকট হইতে দূরে পড়িতেছে,—যতই দূরে যাইতেছে ততই সতুর মায়া তাহার অন্তরটাকে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে, কোথাও একটু ফাঁক রাখিতেছে না। জগতে যেন আর সকলের অস্তিত্ব নবদুর্গা ভুলিয়াছে; বুঝি এক সতু ভিন্ন আর কেহ বা কিছু তাহার চিন্তনীয় বা দর্শণীয় নাই। কিন্তু হায়! এই সতুই কি তাহার? সতুর উপরই কি তাহার কোন দাবি দাওয়া, কি কোন জোর আছে? না, কিছু না, কিছু না—তাহা যদি থাকিত, শক্তিহীন শ্রান্ত চরণদুটি তাহাকে সতুর বক্ষ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে অসমর্থ হইলে, সে যখন তাহার সতুর গমনাগমন পথে প্রবল দর্শনাকাঙ্ক্ষা লইয়া বসিয়া থাকে, সতু তাহার দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া, আপন মনে, আপন কাজে চলিয়া যাইতে পারিত না। সতুর মা আর কেন দিনে দশবার তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় না?—তাঁহার আহার স্থলে আসিয়া বসে না—এ প্রশ্ন না করিয়া সে থাকিতেই পারিত না। কিন্তু সতুর মা আর সে পূর্ব্বের সতুর মা নাই, তাহার নিরালস কর্ম্মনিপুণ হস্ত পদ এখন অলস অকর্ম্মণ্য, সে এখন শক্তি, স্মৃতি, বুদ্ধিবিবেচনা হীন, শত্রুর কৌশলে হতশ্রদ্ধ

অভাগী নবদুর্গা এখন রাজেন্দ্রের লক্ষ্যের বাহিরে, সে স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য ভোগ করুক, জীবন বা মরণ লাভ করুক, পুলকপ্রফুল্ল বা অশ্রুজলে লুণ্ঠিত হউক—মানে, সম্ভ্রমে, জ্ঞানে, গরিমায় উন্নত ডেপুটীবাবুর তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাঁহার সময় অমূল্য, কর্ম্ম অগাধ; কোন ছোটখাট খুটিনাটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার অবসর তাঁহার নাই। আশ্রিত লোকজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবার, রোগ-বালাইয়ের প্রতিকার করিবার ভার, ম্যানেজার গাঙ্গুলী মহাশয়, ছেলেদের দিদিমা স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকুরাণী এবং পত্নী রত্নবালার উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত।

এদিকে, ডেপুটিবাবু যখন বাহিরের কাজে ব্যস্ত,—ডেপুটিবাবুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী তখন কন্যার সংসারে আপন অধিকার ও দৃঢ়কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ করিবার নিমিত্ত পুরাতন দাস দাসী পাচক পাচিকাদের সকলকেই একে একে বিদায় দিয়া, তৎস্থানে নূতন নিযুক্ত করিয়া,—তাঁহার সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিনী সতুর মাকে বিদায় করিবার বন্দোবস্তটা পাকা করিতেছিলেন। সতুর মা,—হোক সে বৃদ্ধা, করুক সে রোগ ভোগ, থাকুক সে তাঁহার অধীনে,—তবু পুরাতন লোক, তাঁহার অন্যায় অত্যাচার

অযথা প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তাহার অর্থপূর্ণ নীরব দৃষ্টির কষাঘাতে—তাহার তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে তিনি সরম-সঙ্কোচে কাতর; তাঁহার গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ, চেষ্টা ব্যর্থ, শক্তি পরাজিত। তুচ্ছ একটা দীনহীনা দাসীর কাছে নিশি দিন এ পরাভব অসহনীয়। সুতরাং বহুদিনের যুক্তি পরামর্শের পর নবদুর্গার এই শক্তিহীন অবস্থায় তাহাকে বিদায় করাই স্থির হইল। একবার কেবল কর্ত্তার অনুমতির অপেক্ষা। কিন্তু কর্ত্তা কি সহজে তাহাতে সম্মত হবেন ? সতুর মা'র দোষ ত তাঁ'র চোখে বড় পড়ে না ? তা'তেই ত মাগী অত বেড়ে উঠেছে ! যাহা হউক শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর প্রস্তাব অবিলম্বেই কর্ত্তার কানে উঠিল। গৃহ-কর্ত্তা রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"এতকালের পুরোণ লোক, আমি যাও বলতে পারব না। তবে, ওর জন্যে নেহাত যদি তোমরা অসুবিধা বোধ কর, বল না হয় ছোট খুড়ীর কাছে কাশীতে ওকে পাঠিয়ে দিই। ছোট খুড়ী একলা মানুষ—তাঁর সামান্য যা কিছু কাজ কর্ম্ম করবে, খাবে, থাকবে, এখান থেকে পেন্সনের মত মাসে মাসে দু চার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।" মনে মনে বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন—রোজ রোজ আর এ ঝঞ্ঝাট রাখব না। আজ একথা কাল সেকথা আর শুনতেও পারি

না। কাশী পাঠানই ঠিক। তা'তে দু'দিকই রক্ষা হবে, বুড়ীও খুসী হবে, বাড়ীর মেয়েরাও বাঁচবে। সতুর মাও যত বুড়া হচ্চে তত যেন বাড়িয়ে তুলেচে। পুরোণোই হোক আর যাই হোক চাকরাণী ত বটে? সত্যিইত! তোর বাপু অত গিন্নীপনা কেন? তুমি বাপু যেমন বুড়ো হয়েছ কাজকর্ম্ম করতে পার না; খাওদাও থাক, কোন কষ্ট পাবে না, তা নয় মাগীর সকল দিকে চোখ কান, সকল কথায় কথা, সামান্য একটা চাকরাণীর গৃহিণীর উপর গৃহিনীপনা বাস্তবিক অসহ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবদুর্গা শুনিল তাহাকে কাশী পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বধূমাতার প্রিয় দাসী বেশ গুছান কথায় বলিয়া গেল,—সতুর মা শিগ্‌গীর তোমার জিনিস পত্তর গুচিয়ে নাও; বাবু তোমায় কাশী পাঠাবেন! পূণ্যের শরীর সতুর মা তোমার; তাই এই বুড়ো বয়সে না চাইতে না যাচ্‌তে বাবু নিজেই তোমায় কাশীবাস কত্তে পাঠাচ্চেন। সকলের আগে সে যে এ সুসংবাদটা দিতে আসিয়াছে, সেজন্য সতুর মায়ের কাছে সন্দেশ খাইবার প্রস্তাবটা করিতেও ভুলিল না।

হরি হরি! একি আনন্দ সংবাদ? সতুকে ছাড়িয়া, তাহাকে নয়নান্তরালে রাখিয়া কাশীবাস করিতে হইবে, সতুর মায়ের পক্ষে কি এ শুভ সংবাদ?

মুহূর্ত্তে নবদুর্গা অন্ধকার দেখিল; সতুকে দূরে রাখিয়া, তাহাকে কাশীবাস করিতে হইবে? হায়! হায়! ইহা অপেক্ষা যে তার মরণ ভাল ছিল। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান তাহার আকাঙ্ক্ষিত নাই, যেখানে তাহার সর্ব্বস্বধন সতুর মুখ দেখিতে পাইবে না।

নবদুর্গা বুঝিল। বুঝিল, তাহার প্রতি রাজেন্দ্রের অনাদর অবজ্ঞা এইবার চরমে উঠিয়াছে। তাহাকে পুণ্যার্থে কাশী পাঠান নয়, ইহা তাহার সুখের সংসার হইতে হত-ভাগিনীকে নির্ব্বাসনের কৌশল! বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া নবদুর্গা উঠিল;—ইচ্ছা রাজেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া কাশীযাত্রা রহিত করা।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার,—আকাশের এক প্রান্তে জমাট বাঁধা কাল মেঘ,—বাতাসটা এলোমেলো,—চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ গম্ভীর। নবদুর্গা কম্পিত-পদে ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া রাজেন্দ্রের শয়ন কক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এলোমেলো বাতাসে তাহার হাতের আলোটা নিবিয়া গিয়াছিল, দুর্ভেদ্য অন্ধ-কারের মধ্য দিয়া, অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে করিতে, চিন্তিত মনে রাজেন্দ্রের শয়ন গৃহের দ্বারে আসিয়া, নবদুর্গা ডাকিল—"রাজেন্! রাজাবাবু!"

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—"কে?"

"আমি। আমি সতুর মা,—একবার দরজাটা খুলবে?"

গম্ভীরস্বরে রাজেন্দ্র উত্তর করিলেন "কি? সতুর মা তুমি? ওঃ জিগেস করতে এসেচ বুঝি, কাল কখন তোমায় যেতে হবে? কাল সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ

মিনিটে গাড়ী ছাড়বে, তুমি সাড়ে নয়টার আগে ঠিক ঠাক্ হয়ে থাকবে! ষ্টশনে পৌঁছন চাই দশটার আগে, বুড়োমানুষ নেহাত তাড়াতাড়ি পেরে উঠবে না, একটু আগে থাকতে যাওয়া ভাল। যাও অনেক রাত হয়েচে আজ ঘুমোওগে কাল গাড়ীতে ঘুমতে পারবে না।"

রাজেন্দ্রের শেষ কথাগুলার স্বর অপেক্ষাকৃত কোমল।

বৃদ্ধার হৃদয় আশা নিরাশায় দ্রুত স্পন্দিত হইতে; লাগিল; সে প্রাণপণে শক্তিসঞ্চয় করিয়া বলিল—"কিন্তু একটা কথা, আমি তোমায় একটা কথা বলতে এসে—"

নবদুর্গার কথায় বাধা দিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে রাজেন্দ্র বলিলেন—কথা-টতা এখন শুনতে পারব না, আজ আমার শরীর ভাল নেই, যা বলতে চাও কাল বোল, যাও। কাল ভোরে উঠে, কাশী যাবার জন্য নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করে প্রস্তুত হয়ে থেক।"

রুদ্ধদ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে নবদুর্গা বলিল—"রাজেন্, বাবা, দরজাটা খুলে আগে আমার একটা কথা শুনে—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত রাজেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ বড় বিরক্ত করলে

ত তুমি ? বল্‌চি আমায় শরীর ভাল নয় এখন কোন কথা টথা শুনতে পারব না, তবু বার বার ওই—”

সঙ্গে সঙ্গে বধূমাতাও রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন— “তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে নাকি ? শুনচ মানুষের অসুখ করচে, কষ্ট হচ্চে, তবু এই ঘুমের সময় জ্বালাতন করচ কি বলে ? যাও নীচে নেবে যাও।”

উভয়ে নীরব হইলেন।

নবদুর্গা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দ্বারে মস্তক রক্ষা করিয়া দাঁড়াইল ; তাহার সমস্ত দেহমনের শক্তি যেন অন্তর্হিত হইল, চরণ দেহভার বহনে অসমর্থ হইল !

ক্ষণপূর্ব্বের এলোমেলো বাতাস ক্রমে ভীষণ ঝড়ের আকার ধারণ করিয়া বিকট বোঁ বোঁ গোঁ গোঁ শব্দে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্যের মত দিগ্বিদিকে ছুটিয়াছে, প্রাণীমাত্রেরই ভীতি উৎপাদক বিরাট অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সেই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মাঝে বাগানের গাছপালা গুলা মুহূর্ত্তে পতনভয়ে ভীত হইয়া হায় হায় করিয়া উঠিল ; গৃহমধ্যে রাজেন্দ্রের শিশুকন্যা নিদ্রাভঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল। সে স্বরে চমকিত হইয়া প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে নবদুর্গা দ্রুত অগ্রসর হইল, কিন্তু বৃদ্ধার পক্ষে অন্তর বাহিরের সে

প্রবল ঝড়ের সহিত বেশীক্ষণ যুঝিতে পারা অসম্ভব! তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়া আসিল, বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না, নবদুর্গা অবসন্ন দেহে এক স্থানে বসিয়া পড়িল।

তুমুল ঝড়ের অবসানে তাহার মস্তকের উপর দিয়া এক পসলা বৃষ্টিও হইয়া গেল তথাপি নবদুর্গার হুঁস নাই। গভীর চিন্তার মাঝে বুঝি বা সে তাহার বোধশক্তি হারাইয়াছিল!

বহুক্ষণ একভাবে থাকিয়া সহসা নবদুর্গার কম্প উপস্থিত হইল, তাহার মস্তিষ্কের ভয়ানক একটা যন্ত্রণা অনুভূত হইল, পিপাসায় কণ্ঠ ওষ্ঠ শুষ্ক হইল। নবদুর্গার স্মরণ হইল, এই ভাষণ ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝে একা সে তাহার গৃহের বাহিরে বসিয়া আছে, সভয়ে একবার সম্মুখে চাহিয়া অতি কষ্টে কম্পিত পদে নবদুর্গা আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিল, যথাসম্ভব শীঘ্র কাপড় বদলাইয়া অনেকটা শীতল জলে পিপাসা শান্ত করিয়া বিষণ্ণ মনে কম্পমান্ দেহে নবদুর্গা শয্যা আশ্রয় করিল।

* * * *

কে কাশী যাইবে? গাড়ীর সময় হইয়া আসিল, নবদুর্গার যাত্রার সময় নিকটতম হইল। কাশীতে তাহাকে

পৌঁছিয়া দিয়া আসিবে যে দ্বারবান্, নিজের আহারাদি শেষ করিয়া, জিনিষপত্র গুছাইয়া যথাসময়ে আসিয়া হাজির, কিন্তু সতুর মা কই ? কোথায় ? সে ত যাত্রার কোন উদ্যোগ করে নাই, এমনকি সে এখন তাহার ঘরের দ্বার খুলিয়া বাহিরেও আসে নাই।

সতুর মাকে বিদায় করিবার আগ্রহ যাঁহার অধিক তাঁহার আজ্ঞাক্রমে এক জন পরিচারিকা তাহার খবর লইতে গেল। কিন্তু দ্বার অর্গলহীন দেখিয়া ভিতরে গিয়া শয্যার উপরে সতুর মায়ের জ্বর-তপ্ত চেতনাবিহীন-নিস্পন্দদেহ স্পর্শ করিয়া চমকিত হইল! "এ কি ? সতুর মা! সতুর মা! তোমার কি জ্বর হয়েচে,—তুমি উঠ্‌তে পাচ্চনা ? সতুর মা ?" সতুরমার সাড়া মিলিল না, সে নীরব নিস্পদ জ্ঞানশূন্য। দাসী এ সংবাদ লইয়া গৃহের বাহিরে আসিল।

রাজেন্দ্র শুনিলেন সতুর মায়ের জ্বর হইয়াছে—জ্বর ভাল হইলে তাহার যাওয়া হইবে।

সপ্তাহ পরে গাঙ্গুলি মহাশয়ের নিকট শুনিলেন, এখনও সতুর মা সুস্থ হয় নাই ব্যায়ারাম তাহার শক্ত, বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার আবশ্যক।

রাজেন্দ্র হুকুম দিলেন—"যাহা কিছু আবশ্যক দিও

আর যাতে যত্নের অভাব না হয় তুমিই তার বন্দোবস্ত কর।” স্ত্রীকে বলিলেন—“সতুর মাকে একটু দেখো, পুত্র কন্যা-হীনা অনাথা মানুষ, চিরদিন আমাদের সংসারে আছে মরণ-কালে যেন কোন কষ্ট না পায় সেদিকে দৃষ্টি রেখ।”

ডাক্তার আসিলেন, রোগীর রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন, গাঙ্গুলি মহাশয় যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু নবদুর্গা সুমিষ্ট বচনে সবিনয়ে সে সকলের প্রত্যাখ্যান করিল। ঔষধ বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিল না; একটী প্রাণীরও সেবা গ্রহণ করিল না, গৃহ শয্যা বসনাদির পরিবর্ত্তন করিল না, কাহাকেও কোন কষ্ট বা মনোবেদনা দিল না, অথচ কৌশলে ধীরভাবে আপন কর্ম্ম আপনি সম্পন্ন করিতে লাগিল—কাহাকেও জানিতে দিল না কতটা সে গ্রহণ করিল আর কি বা সে প্রত্যাখ্যান করিল।

নবদুর্গা নীরবে প্রসন্নমুখে আপন রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে একটি দিবসের প্রতীক্ষায় রহিল।

রাজেন্দ্র বাহির হইতে অন্যের নিকট প্রত্যহই তাহার সংবাদ লয়েন কিন্তু নিজে যে দিন তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া, কোন দিন বা তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে দিন সে হৃদয়ে শত স্বর্গের সুখ

অনুভব করে, তাহার রোগ যাতনা অর্দ্ধেক উপশম হয়, জননী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ নয়নে পুঞ্জীভূত করিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নির্ণিমেষে সে তাঁহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া শত শুভাশীর্ব্বাদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করে। অন্ধ রাজেন্দ্র সে দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝে না বুঝিবার চেষ্টাও করে না।

ক্রমে নবদুর্গা যখন বুঝিল যমের হাত হইতে এবার আর তাহার নিস্তার নাই, বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয়কে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল—"সকলি ত হইল, নারায়ণ সম্মুখে তামা তুলসী হাতে ল'য়ে যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চিরজীবন প্রাণপণে তা পালন করেচি। এখন এ অন্তিমে সন্তান বর্ত্তমান থাকতে বেড়া আগুণে ত পুড়তে পারব না ;— প্রাণ থাকতে প্রকাশ করব না বলেছিলাম তাই হবে ; তারপর মহাপ্রাণ যখন পঞ্চভূতে মিশবে তখন সতুকে আমার শত সহস্র আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলবেন, সতু যেন নিজে আমার মুখাগ্নি করে—আর বৈষ্ণব দিয়ে আমায় শ্মশানে না পাঠায়। আরও"—স্বর্গীয় পতিদেবকে স্মরণ করিয়া সজল চক্ষে নবদুর্গা বলিল—"আরও একটা কথা বল্‌বেন—সতুর পিতা নিঃসন্তান ছিলেন বলেই একটু জল

পিণ্ড পাবার আশাতেই নিতান্ত বৃদ্ধবয়সে চতুর্থ পক্ষে আমায় বিবাহ করেছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত সতু তার পিতৃ-পুরুষকে এক গণ্ডুষ জল দিতে পারেনি; বলবেন এইবার যেন সে পিতৃপুরুষকে এক গণ্ডুষ জল দেয়। তাকে আর আমার বলবার কিছু নেই। আর, আপনি! আপনাকে আমি কি বলব, চিরদিন ধর্ম্মপ্রাণ বড় ভাই যেমন দুঃখিনী বোনকে সর্ব্বদা রক্ষা করে, আপনি চিরজীবন তেমনি আমায় শত বিপদ আপদে রক্ষা করে এসেছেন, মরণ-মুহূর্ত্তেও আপনার অসীম স্নেহের কাছে আমি ঋণী। আপনার কাছে আমার শেষ অনুরোধ—যে কটা দিন দেহে প্রাণ থাকে, সকলের ব্যবহার যদি অসহ্যও হয়—সতুকে আমার ছেড়ে যাবেন না, তাকে সুপরামর্শ দেয় আপনি ভিন্ন এ সংসারে আর এখন দ্বিতীয় লোক নাই।”

কনিষ্ঠা ভগিনী যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণধূলি লয়—নবদুর্গা তেমনি শ্রদ্ধার সহিত বৃদ্ধের চরণধূলি মস্তকে লইলেন। বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিবেন কি সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার শ্রদ্ধানত হৃদয় যেন এই পূতহৃদয়া নারীর চরণধূলির জন্য ব্যগ্র হইল।

গাঙ্গুলি মহাশয় সতুর মাকে গঙ্গাযাত্রা করাইতে পরামর্শ দিলেন। রাজেন্দ্রবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—“আপনি

যা ভাল বোঝেন করুন ; আমি কিন্তু এ হাঙ্গামে থাকতে পারব না ; আমার হাতে এখন ঢের কাজ।”

নিকটেই একজন ভৃত্য উপস্থিত ছিল অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা সে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দিল।

রাজেন্দ্রের পত্নী শুনিয়া বলিলেন—“সকলই সৃষ্টিছাড়া কথা, শুনলে হাড় জ্বলে, চাকরাণীকে আবার কে কোথায় গঙ্গাযাত্রা করায় ?”

শাশুড়ি একটু চাপা হাসি হাসিয়া বলিলেন—“তাহলে এখন গঙ্গাযাত্রা করাও ; মলে বৃষোৎসর্গ করো ; মা খুড়ি মলে যেমন করে থাকে।” ঠাট্টা বিদ্রূপে ব্যতিবস্ত হইয়া রাজেন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয়কে বলিলেন—“থাক্‌গে আর গঙ্গাযাত্রা করায় না, অনেক দিন রয়েচে, আপনার লোকের মত হয়ে গিয়েচে, মরে গেলে জন কয়েক ব্রাহ্মণকে খাইয়ে দেওয়া হবে, আর অনাথাশ্রমে মণ কতক চাল ডাল পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাহলেই হল, আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, লোক হাসবে।”

গাঙ্গুলি মহাশয় বৃদ্ধার দুর্গতি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; উদ্দেশে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া,—রাজেন্দ্রকে অন্তরালে ডাকিয়া সকল কথা পরিস্কার করিয়া বলিলেন।

বিস্ময়াভিভূত রাজেন্দ্র বলিলেন—"এতদিন বলেন নাই কেন ?

ম্যানেজার সবিনয়ে জানাইলেন স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় তামা তুলসি গঙ্গাজল হস্তে দিয়া নারায়ণ সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করাইয়া ছিলেন একথা তাঁহারা কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পাইবেন না।

রাজেন্দ্রের মূর্ত্তি গম্ভীর হইল। শত ধিক্কারে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইল।

যাত্রার আয়োজনে বেশী বিলম্ব লাগিল না। আজ নবদুর্গার গঙ্গাযাত্রা ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের জননীর অনুরূপই হইল। অগ্রে পশ্চাতে দু'টি সংকীর্ত্তনের দল মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। দৃঢ় আদেশে নির্ব্বাক স্তম্ভিত পুত্রগণের সহিত রাজেন্দ্র তাহারই মধ্য দিয়া নবদুর্গার পুষ্পমাল্য-শোভিত খাট বহন করিয়া চলিলেন !

দরিদ্রকে বিতরণের অর্থ লইয়া আনন্দাশ্রুলোচনে বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয় তাহার অনুসরণ করিলেন।

সংকীর্ত্তনের সাড়া পাইয়া অগণিত বালক বৃদ্ধ যুবা পথের জনতা বৃদ্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহার কর্ণে এ মধুর হরিধ্বনি প্রবেশ

করিল, যাহার চক্ষু এ পবিত্র দৃশ্য দর্শন করিল সেই সবিস্ময়ে বলিল—"মাগী কি ভাগ্যিমানী গো !"

রাজেন্দ্রের কাণ্ড দেখিয়া অনেকেই ভাবিল ডেপুটী বাবু আজ পাগল হলেন নাকি ? নিজের মায়ের চেয়ে একটা চাকরাণীর মরণের যে দেখছি বেশী ঘটা !

গঙ্গাযাত্রির ঘরে নবদুর্গা কোন ক্রমেই থাকিতে সম্মত হইলেন না। রাজেন্দ্র বুঝিলেন—আজ তাঁহার মা জননীর মুক্তির দিন, সংসারের বন্দীখানায় চিরজীবন ভয়ে ভয়ে কাটাইয়াছেন, আজ ভয় ভাবনা শূন্য হইয়া জাহ্নবী-মা'র চরণসৈকত হইতে একেবারে মরণ কোলে আশ্রয় লইবেন। সুসন্তান নীরবে জননীর অন্তিম আদেশ পালন করিলেন।

আনন্দধামের যাত্রী নবদুর্গা আজ ভাগীরথীর বিস্তৃত শীতল বালুতটে মৃত্তিকা উপাধানে শয়ন করিয়া পরিপূর্ণ প্রাণে, যুক্তকরে মধুর হরিনাম গান শ্রবণ করিতে করিতে চিরশান্তি দায়িনীর আগমন অনুভব করিতে লাগিলেন। দেবালয় সমূহের সচন্দন পুষ্পমাল্য ধূপ ধূনার সুগন্ধ বহন করিয়া জাহ্নবীর স্নিগ্ধবায়ু তাঁহার রোগক্লিষ্ট দেহের উপর দিয়া বহিতে লাগিল, জোয়ারের জল প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চির স্নেহময়ী নবদুর্গাকে আজ জীবনের অন্তিমক্ষণে আপন গর্ভধারিণী জননী বলিয়া জানিতে পারিয়া রাজেন্দ্র উন্মত্তপ্রায় হইলেন ; সতী শিরোমণি সাবিত্রী যেমন অপূর্ব্ব কৌশলে কৃতান্তকে পরাজিত করিয়া একদিন পতির জীবন ফিরাইয়াছিলেন, তেমনি প্রাণান্তপণে তিনি আজ তাঁহার জননীকে একবার জীবনে ফিরাইতে চাহিলেন। কত শত অনাথ অভাগা যাঁহার দ্বারে আসিয়া সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পায়, চঞ্চলা লক্ষ্মী যাঁহার গৃহে অঞ্চলা, সুখ শান্তি নিরন্তর যাঁহার সেবায় নিযুক্ত সেই ভাগ্যবানের জননীই না আজ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে নিতান্ত দীনহীনার মত জগতের নিকট চিরবিদায় লইতেছিল! হায়! হায়! এ অসহনীয় চিন্তা রাজেন্দ্রকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল, ক্ষোভে অনুতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হইল। দুঃখিনী জননীর বহু বৎসরের বহু অপমান লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুরূপে যেন রক্তধারা ঝরিতে লাগিল। মুমূর্ষু জননীর তুষার শীতল চরণে মস্তক রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে রাজেন্দ্র তাঁহার অজানিত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলেন।

মৃত্যুশয্যা-শায়িতা নবদুর্গা একবার শিহরিয়া উঠিলেন, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন—"তবে সতু আমার সকলি

জানিয়াছে ? হে নারায়ণ ! প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ ত আমার জীবনের শেষক্ষণে স্পর্শ করিল না ?”

গাঙ্গুলি মহাশয় তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন—“নিষ্পাপ তুমি, তোমার কোন ভয় নেই ; এ দারুণ সত্য প্রকাশে যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ হয়ে থাকে, সে আমার, সে আমার ! আমি হাসিমুখে এর শাস্তি গ্রহণ করব।”

নবদুর্গার হৃদয়ে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হর্ষের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। শক্তিহীন অবশদেহে সর্ব্বান্তঃকরণের শক্তি দিয়া, তুষার শীতল হস্তে আকুল আগ্রহে রাজেন্দ্রকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া নবদুর্গা বলিলেন—“তবে একবার তোর এ দুঃখিনী-মাকে মা বলে ডেকে আমার চিরজন্মের সাধ পূর্ণ কর, দে বাবা এ অন্তিমে মুখে একটু গঙ্গাজল দে, সতু রে কাছে আয় একবার প্রাণভরে তোকে দেখে নিই, ‘আমার ছেলে’ বলে একবার নির্ভয়ে ডেকে নিই।”

পরম যত্নে জননীর শুষ্ক কণ্ঠে বেদানার রস ও গঙ্গাজল দিতে দিতে বালকের মত কাঁদিয়া রাজেন্দ্র ডাকিলেন—“মা”—“মা”—“আমার জন্ম দুঃখিনী মা”—ক্ষীণকণ্ঠে নবদুর্গা উত্তর দিলেন—“সতু বাপ আমার !”

আসন্নমৃতার নয়নদ্বয় হইতে দরবিগলিত-ধারায় অশ্রু

ঝরিতে লাগিল। নবদুর্গা প্রাণপণে জীবনের অন্তিম শক্তিটুকু সঞ্চয় করিয়া হর্ষোজ্জ্বলমুখে জড়িতস্বরে বলিলেন,—"আজ আমার জীবন সার্থক হ'ল, একবার হরি হরি বল বাপ—হ—রি—হ—রি।"

রাজেন্দ্রের চাঁদের মত পাঁচটি পুত্র ও শিশুকন্যাটি পিতার ইঙ্গিতে নবদুর্গার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজেন্দ্র মাতার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"মা, তোমার নাতি-নাতনীরা এসেচে দেখ, আশীর্ব্বাদ কর।"

সে স্বর বৃদ্ধার কানে গেল। অসীম চেষ্টায় চক্ষু খুলিয়া বৃদ্ধা সম্মুখে চাহিয়া হস্তোত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইলেন; অবশ হস্ত উঠিল না, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইল, আর বাক্যস্ফুরণ হইল না! পূতহৃদয়া নবদুর্গা তাঁহার চাঁদের হাট সম্মুখে রাখিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনি, সহস্র চক্ষুর পুলক-বিহ্বল দৃষ্টির মাঝে রাজেন্দ্র তাঁহার সম্মানিত উচ্চ শির গঙ্গা-সৈকতে দুঃখিনীর চরণ-তলে লুটাইয়া বালকের মত অধীরচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন—"মা—মা—জনমদুঃখিনী মা আমার!" সে করুণ ধ্বনি সহস্র হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিল—"মা"—"মা আমার!!"

বিশ্বেশ্বর দর্শনে।

একে একে পাঁচটি কন্যারত্নের পর চিন্তাহরণের জন্ম হওয়ায় ছেলেবেলা একটু অতিরিক্ত আদরযত্নেই তাহাকে মানুষ করা হইয়াছিল, এবং স্নেহাদরের ফলে তাহার দৌরাত্ম্য যখন চরম সীমায় উঠিয়া তাহার পিতা-মাতাকে সতর্ক হইতে ইঙ্গিত করিতেছিল, সেই সময় সহসা এক দৈবজ্ঞের আগমনে তাহার আদরযত্ন হ্রাস হওয়া দূরে থাক, বরং বৃদ্ধিরই সুযোগ হইয়াছিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুর একটি পয়সা আর একটি সুপারি লইয়া চিন্তাহরণের ভাগ্যগণনা করিয়া প্রসন্নমুখে তাহার জননীকে বলিলেন, "মা তুই বড় ভাগ্যবতী! অনেক পুণ্যের ফলে তোর এই সন্তান জন্মেছে, তোর ভাবনা কি মা, তোর ছেলের কপালে এই দেখ রাজদণ্ড রয়েছে!"

সরল বিশ্বাসের সহিত একটী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া যোগমায়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আমার ছেলের হাত দেখলেন, অনুগ্রহ করে আমার হাতটি দেখে বলে দিন, এই ছেলেটি রেখে আমি মরতে পারব কি? আর

আমার বড় সাধ একবার কাশীর বিশ্বেশ্বর অন্নপুন্নো দর্শন করে আসি, তা আমার বরাতে আছে কি ?

দৈবজ্ঞ ঠাকুর তাঁহার হাতটির দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "শুধু কাশী কেন মা তুই কাশী গয়া বৃন্দাবন হরিদ্বার কেদার বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত যাবি ; ঐ ছেলের কল্যাণে তোর পুণ্যকর্ম্ম তীর্থধর্ম্ম সব হবে কোনো অভাব থাকবে না। মা, তোর ছেলের কোলে নাতি দেখে তুই হাসতে-হাসতে মরবি।"

চিন্তার মা তখন গভীর আনন্দে পূর্ণহৃদয় হইয়া কুটীর-মধ্য হইতে ক্ষুদ্র একটি বংশপেটিকা বাহির করিয়া বহু অণ্বেষণে বহুদিনের সঞ্চিত দুটি টাকা বস্ত্রখণ্ডের গ্রন্থি খুলিয়া দৈবজ্ঞঠাকুরের পদতলে রাখিলেন। ঠাকুর সন্তুষ্ট মনে মাতাপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তাহরণের পিতা মাতা পুত্রকে ঠিক রাজা না হউক অন্ততঃ ধনী ও বিদ্বান দেখিবার জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুরন্ত শিশু চিন্তাহরণ জানি না কোন্ সুবুদ্ধির উদয়ে অল্পদিনের মধ্যেই খেলা-ধূলা ছাড়িয়া সুবোধ বালকের মত পিতার আদেশ শরের কলম ভূষোর কালি লইয়া পাতাড়ি বগলে, কোঁচার খুঁটে মুড়ী মুড়কী বাঁধিয়া লইয়া পাঠশালে গেল।

পাঠশালে এ দুর্দ্দান্ত শিশুর আগমনমাত্রে পুরাকালের শাস্তির স্মৃতিগুলি অনুগত ভৃত্যের মত একে একে গুরু মহাশয়ের শরণাগত হইল। কিন্তু সে সকলের বিশেষ আবশ্যক হইল না! পাঠশালার পাঠ স্বল্পদিনেই সমাপ্ত করিয়া চিন্তা গ্রামের স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইল এবং যথাকালে তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পিতা-মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া চিন্তা ইংরেজী-স্কুলে ভর্ত্তি হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিল। কারণ, চিন্তার পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন, কলিকাতার স্কুল-মেসের খরচ নিয়মিত যোগানো অসম্ভব, তবু তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া যথাসম্ভব সংসারের অন্যান্য ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া পুত্রের স্কুলের মাহিনা খাই-খরচ ইত্যাদির জোগাড় করিয়া তাহাকে কলিকাতার ইংরাজী স্কুলে পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

চিন্তা যেদিন ধোপদস্ত ধুতিখানির উপর বকের পালকের মত ধব্‌ধবে সাদা কামিজ আর পায়ে চক্‌চকে বার্নিসের চটি পরিয়া ছোট একটি পুঁটুলিতে নিজের আবশ্যকমত জিনিষগুলি বাঁধিয়া লইয়া পিতার সহিত কলিকাতায় গেল, এই দরিদ্র পরিবারের সেদিনকার আনন্দ বর্ণনাতীত। যে চিন্তাহরণকে চোখের আড়াল

করেন না, এখন হইতে তাহাকে একলা দূরে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। কি করিয়া যে মায়ের দিন কাটিবে তাহা বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না, তবু অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়া যোগমায়া তাঁহার নয়ন-মণিকে নয়নান্তরালে পাঠাইলেন।

চিন্তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া তাহার পিতা যখন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন আনন্দে উৎসাহে তাঁহার বুক যেন দশ হাত; চিন্তার মা ও দিদিদের মনে অজস্র আশা অসীম আনন্দ।

প্রথম বৎসর চিন্তা পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিল। সম্বৎসর পরে নয়ন-মণিকে নয়নে দেখিয়া যোগমায়া পুত্রকে কোলে বসাইয়া তাহার মস্তক আনন্দাশ্রুসিক্ত করিলেন। অন্তরের সমস্ত স্নেহ নয়নে পুঞ্জীভূত করিয়া দিদিরা ছোট ভাইটিকে দেখিলেন। তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশংসাপূর্ণ-নেত্রে সাগ্রহে তাহার মুখে তাহাদের স্কুলের প্রতি কথা প্রত্যেক ঘটনার কথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া শুনিলেন, তাহার বই কয়খানি শ্লেট পেন্সলগুলি একবার নহে দশবার করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, আর সে সকলের অধিকারীকে মনে মনে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মা-বোনের আদর-যত্ন, বাপের সস্নেহ আদেশ-উপদেশ ও শৈশব-সঙ্গীদের সহিত হাসি-খেলায় ছুটীর সপ্তাহ কয়টি নিমেষের মত কাটিয়া গেল। চিন্তা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরেও চিন্তা সম্বৎসরের ধরা-বাঁধার বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; মায়ের হাতে রান্না ভাত তরকারি পিষ্টক পরমান্ন সুতৃপ্তিতে উদরপূর্ণ করিয়া খাইল; বিজয়া দশমীর রাত্রি প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিয়া শৈশব-সঙ্গীদের সহিত কোলাকুলি করিয়া সকলের সঙ্গে সারা গ্রামখানির গৃহে-গৃহে ঘুরিয়া প্রণাম ও মিষ্টমুখ করিয়া আসিল। দিদিদের প্রণাম করিতে তাহাদের শ্বশুর-বাড়ী গিয়া আদর যত্ন স্নেহাশীর্ব্বাদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া ছুটীর অবশিষ্ট দেড়সপ্তাহ কাটাইয়া পিতামাতার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া চিন্তাহরণ কলিকাতায় মেসের একতলার স্যাঁৎসেঁতে ছোট ঘরটিতে আসিয়া বই খাতা পেন্সিল কলম লইয়া আবার সেই বৈচিত্র্য-বিহীন একঘেয়ে জীবন যাপন আরম্ভ করিল।

স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া চিন্তাহরণের যেমন একটা সম্মান্ সম্ভ্রম ছিল, নিতান্ত গরীবের ছেলে বলিয়া অনেকের মনে তাহার প্রতি একটা অসম্ভ্রমের ভাবও ছিল। পরিচিত ছাত্রদের মধ্যে কে কে তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত,

কেই-বা অসম্ভ্রম আনাদের ভাব অন্তরে পোষণ করিত সে তাহা জানিত, তাই নিতান্তই কাজের খাতির ছাড়া সে বড় কাহারো সহিত আলাপ-পরিচয় করিত না; স্কুলের ছুটীর পরে নিজের ঘরটি ছাড়িয়া কোথাও যাইত না, "প্লে-গ্রাউণ্ডে" কাহারো সহিত কোন খেলায় যোগ দিত না, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় সমভাবে একলা সে নিজের কর্ত্তব্য ও অভাবজনিত অতৃপ্তি লইয়া অপরিচ্ছন্ন অন্ধকূপবৎ ঘরটির মধ্যে কাটাইয়া দিত।

প্রথমে যে আনন্দ উৎসাহ লইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, সে আনন্দ উৎসাহ ক্রমে চলিয়া গিয়াছিল। শান্তি ও তৃপ্তিতে যে হৃদয় পূর্ণ ছিল, তাহা নানা অশান্তি অতৃপ্তি ও ক্ষোভে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সহরের লোকের চমকপ্রদ উজ্জ্বল জীবনের তুলনায় তাহাদের পল্লীজীবন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও অনুজ্জ্বল—জীবনযাপন-প্রণালী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাহার মনে হইত। সে দেখিত গ্রামের সহিত তুলনায় রাস্তা-ঘাটগুলি কেমন সুন্দর সুসংস্কৃত, কেমন জীবন্ত ভাবপূর্ণ; ঘর-সংসার কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও কেমন শৃঙ্খলা। সহরের প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে যে বিশেষত্বটুকু ছিল, চিন্তাহরণের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণগুণে সেগুলি আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিত,

আর তাহার শৈশবের স্মৃতি, এমন কি পিতামাতার ও দিদিদের স্নেহস্মৃতিও যেন অনেকটা মলিন হইয়া পড়িত।

ইহার পর পিতার সস্নেহ আহ্বানে আবার যখন পরীক্ষার পরের ছুটীতে চিন্তাহরণ গৃহে আসিল, তখন সে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, কথায় বার্ত্তায় ধরণধারণে তাহাকে সেই চিন্তাহরণ বলিয়া চিনিয়া উঠা ভার। সম্বৎসর যাহারা তাহার দর্শনাশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দিনের পর দিন গিয়াছিল, এখন প্রাণভরা আনন্দ লইয়া তাহারা দেখিল, তাহাদের চিন্তা আর সে চিন্তা নাই, সে এখন তাহাদের হইতে বহু উচ্চে, তাহার নাগাল পাওয়া দায়! বাহিরের লোক একটু ক্ষুণ্ণ হইল। সেই দুরন্ত পল্লীশিশু আজ সহরের সভ্যভব্য শিক্ষিত যুবকে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া মা-বোনের মনে একটু গৌরবমিশ্রিত হর্ষ জাগিল; আর বৃদ্ধবয়সে অর্দ্ধাহার অনাহারের কষ্ট সহিয়া ঋণভার মস্তকে লইয়া এতদিন প্রাণপণে পুত্রকে যে অর্থ যোগাইয়া আসিয়াছেন, এতদিনে তাহা সার্থক হইয়াছে কিন্তু তাঁহার চিন্তা আর সে চিন্তা নাই বুঝিয়া পিতার হর্ষোজ্জ্বল অন্তরে বিষাদের একটু ছায়াপাত হইল।

স্কুল ত্যাগ করিয়া চিন্তাকে এবার কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইবে, তাহার যোগাড়-যন্ত্র করিতে কিছু সময়ের দরকার।

সুতরাং ছুটী ফুরাইবার আগেই চিন্তা কলিকাতায় গেল। এত দিন থাকিতে ছেলেকে ছাড়িতে যোগমায়ার কষ্ট হইল, কিন্তু বাধা দিলেন না! আহা! ছেলের যাহাতে পড়ার ক্ষতি হইবে যোগমায়া মা হইয়া কি তাহা করিতে পারেন?

ছুটী ফুরাইল। চিন্তা কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বাড়ীতে পত্র লিখিলেন। এখন হইতে মাসান্তে আর কতগুলি করিয়া টাকা পুত্রকে পাঠাইতে হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ কি উপায়ে তাঁহাকে যোগাড় করিতে হইবে, চিন্তার পিতা তাহারই চিন্তায় কিছুদিন উন্মন হইয়া রহিলেন। আর মা তাঁহার সংসারের নিতান্ত বাঁধাবাঁধি খরচপত্রের মধ্য হইতেও দুই একটি করিয়া পয়সা রাখিয়া যাহা জমাইতে পারিয়াছিলেন সেগুলির বদলে এই শুভ-দিনে দুটি চকচকে টাকা সেই দৈবজ্ঞঠাকুর আবার যদি কখনো গ্রামে আসেন তাঁহাকে দিবেন বলিয়া বস্ত্রখণ্ডের পর বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া খরচের সময় সহজে নজরে না পড়ে ঘরের এমন একটা নিভৃত স্থানে রাখিয়া দিলেন।

চিন্তার এক সহাধ্যায়ীর চেষ্টায় যাঁহার সুপারিশে চিন্তা একটু সুবিধায় কলেজে ভর্ত্তি হইতে পাইল—চিন্তার প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেন, চিন্তা ছেলেটি মন্দ নয়—শুধু

দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট হইয়াই অকালে দেহমনের স্ফূর্ত্তি হারাইতে বসিয়াছে। ইহাকে সাহায্য দ্বারা উন্নত করার এই উপযুক্ত সময়, এবং ভবিষ্যতে এ সাহায্যের শুভ ফল ফলিবে সন্দেহ নাই। ছেলেটির মুখের ভাব কথা-বার্ত্তা চলন-ধরণের মধ্যে যে একটা বিষণ্ণতা ও ক্ষোভের ভাব লুকানো ছিল তাহাও তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। বিদায়-কালে স্বীয় নামের একখানি কার্ড দিয়া তিনি চিন্তাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন।

কার্ডে নাম ঠিকানা পড়িয়া চিন্তা বুঝিল, তাহার সাহায্যকারী ভদ্র লোকটির নাম স্যামুয়েল ডি, এন, মল্লিক, বাড়ি বেশী দূর নয়, চিন্তার মেসের কাছাকাছি,—ইচ্ছা বা আবশ্যক হইলে যাওয়া-আসার বিশেষ অসুবিধা হয় না, কিন্তু এতটা কাছে বাড়ী জানিয়া চিন্তা কিছু চিন্তিত হইল। তাহার যেরূপ হীনাবস্থা তাহাতে বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ; নিকটে সম্ভ্রম-হানির বিশেষ সম্ভাবনা, আর সেটা চিন্তার কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অনুরোধ রক্ষার্থে একদিন চিন্তা সসঙ্কোচে স্যামুয়েল সাহেবের বাড়ি গিয়া

উপস্থিত হইল। সাহেব গৃহে ছিলেন, তাহার আগমনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী-কন্যা ও পুত্রদের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন, তাঁহারাও চিন্তার সহিত প্রথম হইতেই বেশ পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিলেন, বহুক্ষণ বহু প্রীতিকর আলোচনার পর অবসর মত আর একদিন আসিতে অনুরুদ্ধ হইয়া চিন্তা সে দিনকার মত বিদায় লইয়া তাহার নির্জ্জন অন্ধকূপবৎ ঘরটিতে ফিরিয়া আসিল।

প্রথম সাক্ষাতের পর নিজের প্রয়োজন ও মল্লিক-পরিবারের অনুরোধক্রমে আরো কয়েকবার স্যামুয়েল সাহেবের বাড়ী যাওয়ায় চিন্তার সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রতি মল্লিক-পরিবারের অপ্রত্যাশিত সদাচরণে চিন্তা পরমাপ্যায়িত হইয়াছিল। কিন্তু এই ধনী-পরিবারের সংস্রবে আসিয়া চিন্তার নিজের দারিদ্র্য আরো ভীষণ আকার ধারণ করিল। নিজের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনের উপর তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিল। স্যামুয়েল সাহেবের বাড়ী হইতে সদ্যঃ-প্রত্যাগত চিন্তাহরণ যখন আবার নিজের জীর্ণ শয্যা অতি সামান্য গৃহসামগ্রী ও স্বল্প সংখ্যক বস্ত্রাদির দিকে চাহিত, তখন আরো গভীর ভাবে নিজের দৈন্য অনুভব করিয়া মনে-মনে দারুণ অশান্তি

ভোগ করিত। গভীর রজনীতে নিদ্রাহীন চক্ষে চিন্তা ভাবিত—এ দারুণ দৈন্য ঢাকিবার কি কোনো উপায় নাই? এ লজ্জাজনক হীনাবস্থা হইতে উদ্ধারের কি কোনো সহজ পথ নাই? সত্য বটে সহরে অন্যের তুলনায় চিন্তাহরণের জীবন নিতান্তই একঘেয়ে রকমে চলিতেছিল। কিন্তু তাহার সেই বৈচিত্র্যহীন জীবনকেই চালাইবার জন্য গ্রামে তাহার জনকজননীকে যে দুঃখ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছিল, চিন্তার তাহা ভাবিবার অবসর—বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না। স্নেহাধিক্য বশতঃ পিতা মাতা পুত্রকে এ সম্বন্ধে কিছু জানাইয়া ভাবনায় ফেলিতে চাহিতেন না। এক একবার নিতান্ত অর্থ-কষ্টের উপর নিজের শরীর যখন অবসন্নতার ভাবে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিত; সেই সময় চিন্তার পিতা বলিতেন—"আর না এইবার চিন্তাকে বলে পাঠাই আমার সাধ্যে যতদূর হ'বার হয়েছে, এখন তুমি নিজের পড়ার খরচ নিজে কোনো রকমে চালিয়ে নেও, এই বুড়ো বয়সে দুর্ব্বল দেহে ঋণের ভাবনা আর ভাবতে পারি নে।" কিন্তু যোগমায়া বলিতেন,—"আহা একে বাছা আমার একলা বিদেশে পড়ে আছে, তার উপর আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়ে তাকে ভাবানো কি আমাদের উচিত! শুনেই-বা সে কি করবে, এখন আমরা

না দিলে সে পাবেই বা কোথায় ? এখন কষ্ট যাচ্চে বলে এ দুঃখ আমাদের চিরদিন থাকবে না, চিন্তা আমাদের রোজগার করতে শিখলে দুদিনে ধার-কর্জ্জ সব শোধ হয়ে যাবে, আমরা সুখী হব।” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর অধিক দিন চিন্তার নিকট এ সঙ্কটজনক আর্থিক অবস্থা লুকাইয়া রাখা গেল না। গ্রামের লোকের কাছে আর অধিক কর্জ্জ পাওয়া গেল না। গৃহের বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীও নিঃশেষ হইল।

পিতার পত্রের উত্তরে চিন্তা অনেক দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া অবশেষে লিখিয়া দিল,—“আমার মেসের খরচটা কোনো রকমে নিয়মিত পাঠাইবেন, কলেজের খরচ আমি কোনো রকমে ঠিক করিব।”

২

কলেজে গিয়া অবধি পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া চিন্তা আর এবারকার ছুটিতে বাড়ী গেল না। সম্বৎসর আশা করিয়া থাকিয়া পুত্র আসিবে না শুনিয়া যোগমায়ার মনে বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু আসিবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে পারিলেন না, মা হইয়া ছেলের পড়ার ব্যাঘাত দিবেন কি করিয়া ? তিনি ভাবিলেন—“আহা, বেঁচে থাক —মন দিয়ে লেখাপড়া করুক, মানুষ হোক, আমার ছেলে

আমারই আছে, আজ না হয় দুদিন পরে দেখব। টাকা তো নেই যে, নিজে গিয়ে দেখে আসবো, সে নাইবা এল, আমাদের কি আর যেতে নেই?—তা সে টাকা কই এখন?" যোগমায়ার অন্তর হইতে কে যেন বলিল, "তোর ভাবনা কি মা? তুই তো রাজার মা!" যোগমায়া নানা কথায় মনকে প্রবোধ দিয়া পুত্রের অদর্শনকষ্ট ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিদিরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইয়ের অনুপস্থিতি-হেতু দেওয়ালের গায়ে ফোঁটা দিয়া উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনে মনে হরির পায়ে মাথা খুঁড়িয়া বলিল,—"হরি বাঁচিয়ে রাখ, এক ভাই আমার সহস্র হোক, সুনাম সুখ্যাতিতে দেশ পূরুক, ছোট ভাইটি হতে আমার বাপের বংশ উজ্জ্বল হোক!"

যাহা হউক, সুখ, দুঃখ আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া আরো একবৎসর কাটিয়া গেল। চিন্তার পিতার নিকট পত্র আসিল, এবারও চিন্তা পরীক্ষা পাশ করিয়া পরবর্ত্তী শ্রেণীতে পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। নূতন পড়ার বন্দোবস্তেই ছুটী ফুরাইল, আর দেশে যাইবার সুবিধা হইয়া উঠিল না! আগামী ছুটীতে নিশ্চয় যাইবে।

ছেলে আবার পাশ করিয়াছে, কিন্তু বাড়ী আসিতে পারিল না, এই আনন্দ ও দুঃখে যোগমায়া হাসিয়া কাঁদিয়া

অস্থির হইল। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া তুলসী-তলায় হরির লুট দিল; দেবালয়ে-দেবালয়ে যথাসাধ্য পূজা দিয়া আসিল। কিন্তু সেইদিন গ্রামের মধু সর্দ্দার চিন্তার পিতাকে বাহিরে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিয়া গেল, তিনি সহসা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, নিশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল! পরক্ষণেই আবার কোটরগত চক্ষু দুটি অশ্রুপ্লাবিত হইল, কিন্তু সে অশ্রু ঝরিয়া পড়িবার আগেই আবার দারুণ ক্রোধের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। নয়নে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইল! ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, ক্ষোভ বিস্ময় ও ক্রোধের উত্তেজনায় ক্ষণে ক্ষণে মুখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল! তিনি বহুকষ্টে মনোভাব সম্বরণ করিতে করিতে যোগমায়াকে ডাকিয়া বলিলেন, "গিন্নি, ঘর থেকে আমার চাদরখানা আর ছাতিটা দাও তো, আমায় একবার বাইরে যেতে হবে।"

যোগমায়া রন্ধনশালা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন গা, কোথায় যেতে হবে এখন? অন্যমনস্কভাবে চিন্তার পিতা বলিলেন, "কলিকাতায় চিন্তার কাছে।"

উত্তর শুনিয়াই যোগমায়ার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল,

চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায়! চিন্তার কাছে? কেন? বাছার আমার অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? ওগো বলনা গা হঠাৎ চিন্তার কাছে যাবে কেন? কি হয়েছে তার?"

গৃহিণীর উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া চেষ্টাভূত হাস্যে প্রফুল্ল ভাব দেখাইয়া চিন্তার পিতা বলিলেন, "না গো না, সে-জন্য তোমার ভাবনা নেই, তোমার চিন্তা ভালোই আছে; আমি কলকাতায় যাচ্চি একটা বিশেষ দরকারে। কলকাতায় যখন যা'চ্চ চিন্তার বাসায় যাব না তো আর কোথায় যাব?"

যোগমায়ার মন এ কথায় শান্ত হইল না; বহুবার বহু প্রশ্ন করিয়া জানিবার চেষ্টা করিলেন—"চিন্তা ভাল আছে ত? কোনো অসুখ হয় নি ত?" চিন্তার পিতা বিশেষভাবে বুঝাইলেন যে, চিন্তা বেশ ভালই আছে, সে-জন্য ভাবনা নেই, কিন্তু যে দরকারে তিনি যাইতেছেন কাজ সারিয়া ফিরিতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগিবে।

• তাঁহার অনুরোধক্রমে মধু সর্দ্দার ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল, টিকিট কিনিয়া তাড়াতাড়ি দুজনে ট্রেণে উঠিলেন। গাড়ীতে বসিয়া চিন্তার পিতার অন্তর আর বাধা মানিল না; মুখে উড়ানি ঢাকা দিয়া বৃদ্ধ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। মধু সর্দ্দার তাঁহাকে শান্ত করিয়া

বলিল,—"বিপদের সময় অত অধৈর্য্য হলে চলবে না খুড়ো মশায়, একটু শক্ত হয়ে খোঁজ-তল্লাস করে আইন-কানুন দেখে বেটাদের হাত থেকে চিন্তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তার দোষ কি ? ছেলে মানুষ বোঝে-সোঝে নি, পাঁচজনের কুহকে পড়ে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে। শুনেছি এখনো দীক্ষা হয়নি, জর্ডনের জল মাথায় পড়েনি, এখনো উদ্ধারের সময় আছে। দেশের লোক এখনো কিছু শোনেনি, কিছু জানাজানি হয় নি, কোনো গোল হবে না। এখন কোনো রকমে একবার এনে ফেলতে পারলে হয়, একবার তাকে হাতে পেলে আর ভায়ার ছাড়ান নেই। চিন্তার পিতা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন, উত্তর দিলেন না ; উত্তর-প্রত্যুত্তরের শক্তিও বোধ হয় তখন তাঁহার ছিল না, তিনি তখন কেবল সংশয়ের সহিত ভাবিতেছিলেন, "অঁ্যা চিন্তা, আমার সেই চিন্তা ! বুকের রক্ত দিয়ে এত কাল যাকে মানুষ করে এলুম, আজ তারই এই কাজ ! এত শিক্ষার শেষে এই ফল হল !"

মধু সর্দ্দার আবার আপন মনে বলিল—"দোষ নেই খুড়োমশায়, চিন্তার কোনো দোষ নেই, ওরা কি যাদু জানে, বুড়ো-বুড়ো লোকগুলোর মাথা ঘুরিয়ে দেয়, আর চিন্তা তো আমাদের এই সেদিনকার ছেলে, কলেজে

পড়েচে তাই বিদ্যেটাই না হয় শিখেছে, বুদ্ধি তো পাকে নি ?”

চিন্তার পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “বল তো কে সে সামুয়েল সাহেব—আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে, আমার প্রস্তুত অন্নে ছাই দিলে !” বৃদ্ধের বদনে আবার যুগপৎ ক্রোধ ও ক্ষোভের চিহ্ন প্রকটিত হইল।

কিছুতেই কিছু হইল না। এক সপ্তাহ ধরিয়া অনেক সলা-পরামর্শ অনুরোধ-উপরোধ ও উকীলের বাড়ী হাঁটা-হাঁটি ছুটাছুটী করিয়া মধু সর্দ্দার ও চিন্তার পিতা হতাশ হইয়া বাসায় ফিরিলেন। চিন্তার উদ্ধারসাধন হইল না। চিন্তা শিশু নিরক্ষর বা উন্মাদ নহে, সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান ও সাবালক, সুতরাং পাপ হইতে পরিত্রাণ-কামনায় ধর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া স্ব-ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে সে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে তাহার পিতা-মাতার বা বন্ধু-বান্ধবের কিছু বলিবার নাই। ভগ্নহৃদয় ক্ষীণ আশায় বাঁধিয়া চিন্তার পিতা বলিলেন, “মধু চেষ্টা কর, একবার যাতে চিন্তার সঙ্গে দেখা করতে পারি, আইন-কানুন চুলোয় যাক আমি একবার তার মনের কথাটা—তার নিজের মুখে শুনে বুঝব। আমি যে তার বাপ, সে আমার ছেলে

তার নিজের মুখের কথা শুনে লোকের কথায় আমি ফিরতে পারবো না।"

বহু চেষ্টায় চিন্তার পিতা চিন্তার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইলেন। পিতার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব সকলই হইল, কিন্তু স্যামুয়েল ডি এন, মল্লিকের ভাবী জামাতা শ্রীমান্ চিন্তাহরণ নূতন আলোক ও নবজীবন হইতে আর অন্ধকারে ফিরিল না।

চিন্তার পিতা চিন্তার বর্ত্তমান গ্যাসদীপ্ত সুবাসামোদিত সুসজ্জিত পাঠগৃহ হইতে বাহির হইয়া শুনিতে পাইলেন, কোনো তরুণী বীণানিন্দিত-স্বরে চিন্তাকে প্রিয় সম্বোধনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে পালাবার নানা ফন্দি এঁটে কে সে বুড়োটি এইমাত্র তোমার কাছে এসেছিল বলত?"

চিন্তা তাহার কি উত্তর দিল তাহা শুনিবার মত ধৈর্য্য ও প্রবৃত্তি তখন তাঁহার ছিল না; কোনোমতে তিনি গেটের বাহিরে আসিয়া মধু সর্দ্দারের স্কন্ধ-অবলম্বনে অর্দ্ধ-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সোজাসুজি ঘরে না গিয়া একটি দিন অন্যস্থানে থাকিয়া দেহমনের কথঞ্চিৎ সুস্থতা বিধান করিয়া মধুসর্দ্দার চিন্তার পিতাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া যোগমায়া শিহরিয়া উঠিলেন—"এ কি গো! এই ক দিনে তোমার এ কি চেহারা হয়েচে! অসুখ করেছিল নাকি! দেহ আধখানা হয়ে গেছে! এ কি! দেখে কান্না পাচ্চে যে!"

চিন্তার পিতা কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"অসুখ কিছু নয়, তবে ঘরে শরীর থাকে এক রকম, আর কোথাও গেলে সময়ে নাওয়া-খাওয়া ঘুম হয় না, শরীর খারাব হয়ে যায়।"

সরলহৃদয়া যোগমায়া তাহাই বুঝিয়া সন্তুষ্টমনে চিন্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিন্তার পিতা কুশল সংবাদ দিলেন, মায়ের প্রাণ শান্ত হইল।

অনুগত প্রতিবেশী মধু সর্দ্দারের সাহায্যে সপ্তাহ-মধ্যে বহুকালের বাসভূমি বিক্রয় করিয়া চিন্তার পিতা চিন্তার শিক্ষাব্যয় সঙ্কুলান-জন্য যে ঋণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পরিশোধ করিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,—"চিরকাল শুন্‌তে পাই, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা-দর্শন করবার তোমার বড় সাধ, তা এইবার চলনা একবার দুজনেই যাই?"

আশ্চর্য্য হইয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা বিশ্বেশ্বর-অন্নপুন্নো দেখতে যাবে তা ভিটে বেচে বাস উঠিয়ে যাবে কেন? দুদিন পরে ফিরে আসতে হবে ত?"

তখন আবার কিনলেই হবে; ধার রেখে তীর্থে যাবো পথে যদি মরেই যাই! টাকা হলে বাড়ী আবার কিনতে কতক্ষণ?"

"এই, মাসখানেক পরেই তো চিন্তা আসবে, সেই সময় গেলে হয় না? তাকে নিয়ে যাবার যে আমার বড় সাধ; আর নিভা যে আমায় বলে রেখেচে—মা, তুমি যখন কাশী যাবে তখন আমায় খবর দিয়ো নিজে খরচ পত্র করে তোমার সঙ্গে যাব, তাকে একবার খবর দাও না?"

চিন্তার পিতা যোগমায়াকে তাড়া দিয়া বলিলেন,—"না না, কাকেও না—কাকেও না, যাকে নিয়ে যাবার সাধ অন্যবারে নিয়ে যো, এবারে দুইজনে যাই চল। আর এক কথা, দূরের পথে যাচ্চ, গ্রামে যার যার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে দেখা করে কথা কয়ে নাও, বলা যায় কি যদি আর দেখা নাই হয়।"

উদ্বিগ্নভাবে যোগমায়া বলিলেন, "কেন আসতে পাবনা নাকি? তোমার কথার ভাবটা কি বল তো? অমন কর তো আমি যাব না, তোমার অন্নপূন্নো-বিশ্বেশ্বর দেখাতে হবে না, আমার চিন্তা আমায় নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে গেলে আমার সব তিথ্যো হবে।"

চিন্তার পিতা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন,—

"হুঁ" বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, কিন্তু সেটা ঠিক হাসি কি কান্না যোগমায়া তাহা ঠিক বুঝিলেন না, স্বামীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন!

চিন্তার পিতা আবার তাড়া দিয়া বলিলেন, "যাবে তো শীঘ্র চল না, আর দেরী কিসের? টিকিট কেনা হয়ে গেছে আজকের গাড়িতেই যাব।" যোগমায়া হাসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার সকলি বিপরীত, যাবে না তো যাবে না, আবার নিয়ে যাবার মন হয়েচে তো আর দেরী সইচে না!"

স্বামী-স্ত্রীতে যাত্রা করিয়া পথে পা দিয়াছেন, এমন সময় ডাক-পিয়নের সহিত মধু সর্দ্দার ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"খুড়োমশায় ডাকওলা আপনার নামের একখানা পোষ্টকার্ড আর দুখানা ইন্‌সিওর্ড্ চিঠি এনেছে, দুটো সই দিয়ে দিন।" চিন্তার পিতা বিস্ময়ের সহিত সই দিবার জন্য কলম উঠাইয়া পোষ্টকার্ডখানা পড়িয়া বুঝিলেন, তাঁহার সুপুত্র নিজের শিক্ষার ব্যয় ও পিতা-মাতার খোরাকি বাবঁদ দুই হাজার টাকা পাঠাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে পাঠাইবার আশ্বাস দিয়াছে। যুবজনোচিত দৃঢ়তার সহিত অকম্পিত হস্তে ইন্‌সিওর্ড পত্র দুইখানির উপর মোটা মোটা গোটা গোটা অক্ষরে "Refused" লিখিয়া পিওনের

হাতে দিয়া একবার উদাস দৃষ্টিতে গ্রামের দিকে চাহিয়া চিন্তার পিতা প্রসন্নমনা প্রফুল্লমুখী যোগমায়ার সহিত মূর্ত্তিমান বিষাদের মত নীরবে ষ্টেশনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তীর্থযাত্রী দম্পতির সম্মুখ দিয়া এক কৃষক-বালক করুণ-স্বরে গাহিয়া গেল—

"ওমা নন্দরাণি! তোর নীলমণিকে হারিয়ে এনু মথুরায়,
কত ডাকনু কেঁদে এলোনা মা কাঁদিয়ে দিলে উভরায়!"

বন্ধু

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহুদিন বহুচিকিৎসার পর চিকিৎসকগণের পরামর্শে যেদিন প্রকৃতির শোভা-সম্পৎপূর্ণ গ্রামের উন্মুক্ত বায়ুতে কিছুদিন বাস করা স্থির হইল, তাহার সপ্তাহ পরেই জগৎবাবু তাঁহার পীড়িতা পত্নী ইন্দুমতীকে লইয়া বঙ্গদেশের এক নদীতীরবর্ত্তী গ্রামে আসিয়া নয়ন-মনোহর বৃক্ষলতাদি-শোভিত একটি উদ্যানবাটিকায় আশ্রয় লইলেন। সঙ্গে রহিল তাঁহার বালিকা-ভাগিনেয়ী নির্ম্মলনলিনী আর হিন্দুস্থানী পাচক ও পরিচারক পরিচারিকাদ্বয়।

হরিদ্বর্ণের শস্যক্ষেত্রগুলি পার্শ্বে রাখিয়া কৃষকপল্লীর মধ্য দিয়া একখানি মোটর গাড়ি যখন নির্ম্মল ও তাহার মাতুল-মাতুলানীকে লইয়া নদীর ধারের বাগানবাড়ি-অভিমুখে ছুটিয়া গেল, কলসী কক্ষে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃতা পল্লীবধূদের কৌতূহল-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটি ধূলা-কাদা-

মাখা সুন্দরী বালিকার অপূর্ব্ব বিস্ময়-পুলকপূর্ণ দৃষ্টি গাড়িখানির উপর পতিত হইল।

"কত বড় একখানা হাওয়া-গাড়ি যাচ্চে রে ভাই দেখ্‌বি আয়"—বলিয়া পরস্পরের দাদা দিদিকে ডাকিতে ডাকিতে, একদল বালক বালিকাকে পথের ধারে ছুটিয়া আসিতে দেখা গেল। চতুর্দ্দিকের বিবিধ সুদৃশ্যের সহিত এ দৃশ্যটিও নির্ম্মলকে আনন্দাভিভূত করিল।

নূতন বাড়িতে আসার পর যেদিন নির্ম্মল তাহার মামাবাবুর সঙ্গে প্রথম ভ্রমণে বাহির হইল, বিশেষ ভাবে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল একদল ক্রীড়ারত পল্লী-শিশুর মাঝে সেই সুস্থ সবল গৌরাঙ্গী বালিকা।

প্রাতে দাসীর সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে গিয়াও স্নানার্থী রমণীগণের সহিত নির্ম্মল বালিকাকে দেখিল। সে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইলে, বালিকা হাস্যমুখে একবার তাহার প্রতি চাহিয়া. ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, নির্ম্মলকে তাহার সহিত আলাপের অবসর না দিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। নির্ম্মল তাহার ব্যবহারে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সে বুঝিল. বাহিরে রাস্তার উপর, নদীতীরে, পুষ্পোদ্যানে বা শস্য-ক্ষেত্রে এই অপরিচিতা বালিকা ছায়ার ন্যায় তাহার

অনুসরণ করে, অথচ তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র বৃক্ষ-লতাদির অন্তরালে লুকাইয়া পড়ে।

নির্ম্মলের মামীমা তাহার অনুরোধক্রমে সন্ধান লইয়া জানিলেন, বালিকা তাঁহাদের প্রতিবাসী-কন্যা তাহাদেরই স্বজাতি, নাম শান্তমণি, কিন্তু আচরণ তাহার রূপ ও নামের সম্পূর্ণ বিপরীত, কৃষকপল্লী তাহার সমগ্র দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত।

ক্রমে সুযোগ মত বালিকার সহিত নির্ম্মলের আলাপ হইল। আলাপ শেষে বন্ধুত্বে পরিণত হইল। কিছু দিনের মধ্যে নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত সকলে দেখিল, সভ্যসমাজের আদব-কায়দায় অনভ্যস্ত, অপরিচ্ছন্ন, কলহ-নিপুণা শান্ত হইল—নির্ম্মলের মত শান্ত শিষ্ট ও নীতি-দুরস্ত মেয়েটীর বন্ধু।

নির্ম্মলের সুন্দর সুবৃহৎ উদ্যান-ভবনের পার্শ্বেই শান্তর পিতার অনতিক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরখানি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর, মৃত্তিকাময় ও তৃণাচ্ছাদিত হইলেও সুনির্ম্মিত, সুতরাং সুদৃশ্য এবং শান্তর লক্ষ্মীস্বরূপিনী জননীর নিপুণ হস্তে প্রত্যেক স্থানের প্রতি সামান্য দ্রব্যটিও সুশৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত ও সুপরিষ্কৃত।

গৃহে শান্তর পিতা মাতা ভিন্ন, পিসিমা, দুটি ভগিনী,

দুটী শিশু সহোদর ও একটি জ্ঞাতি-ভ্রাতা। শান্তর পিতার অবস্থা বড় স্বচ্ছল নয়, গ্রামে পৌরোহিত্য করিয়া, কোনো প্রকারে তিনি পরিবারের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করেন। গ্রামে পুরোহিতের আধিক্য এবং হিন্দু-গৃহে "বারোমাসে তেরো পার্ব্বণের" অভাব না থাকিলেও, এই দরিদ্র কৃষক-প্রধান গ্রামে পৌরোহিত্য করায়, কোনো দিন তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় নাই। কিন্তু সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে তাঁহার আয় নিতান্ত অল্প হইলেও পৃথিবীর সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য যাহার অভাবে ব্যর্থ হয়, রাজ-ভাণ্ডারের বিনিময়েও যাহা পাওয়া যায় না, সেই ধনীর প্রার্থনীয় নরপতিরও লোভনীয়—শান্তিসুখ ও সন্তোষ এই দরিদ্র পরিবারের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান।

ভট্টাচার্য্য দম্পতি নিজের শান্তি সুখেই তৃপ্ত নহেন, পরকেও এই সুখের ভাগী করিতে ইঁহারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ তাহাদের পুরোহিত ঠাকুরের নিকটে ধর্ম্মকথা শুনিয়া ধন্য হয়, কৃষকগণ তাহাদের বিপদাপদে সুপরামর্শের নিমিত্ত ইঁহার নিকটে ছুটিয়া আসে, গ্রাম-বাসিনীরা শান্তর জননীর নিকটে আসিয়া আপনাপন সুখ দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া শোকে সান্ত্বনা, দুঃখ সুখে সহানুভূতি লাভ করে। আপনাদের মধুর প্রকৃতি ও

সদাচরণের গুণে ইঁহারা সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

আচরণ দোষে একা শান্তই কেবল গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতার কাছে অপ্রীতি ও অনাদর পাইয়া আসিতেছিল, এখন কোমলহৃদয়া প্রিয়বাদিনী বুদ্ধিমতী কুমারী নির্ম্মল-নলিনীর বন্ধুত্ব লাভে, সেই শান্তর অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল ; অব্যবস্থিতচিত্ত শান্ত ক্রমে শিষ্ট, শান্ত, লোক-প্রিয় ও সুভাষিণী হইল, দিবসের অধিকাংশ কাল নির্ম্মলের নিকট থাকিতে থাকিতে ক্রমে সে পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হইল, নিন্দার পরিবর্ত্তে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে প্রশংসা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। নির্ম্মলের সহিত বন্ধুত্বে শান্তর আশাতীত পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বুঝিল, স্পর্শমণির স্পর্শে মৃত্তিকা এইরূপেই সুবর্ণে পরিণত হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে একদিন আমতলায় বনভোজনের আয়োজন করিতে করিতে নির্ম্মল শুনিল, তাহার বন্ধুর বর আসিয়াছে। শান্ত খুব উৎসাহের সহিত এই আমোদে যোগ দিয়াছিল, অকস্মাৎ এসংবাদ তাহাকে উৎসাহহীন করিল, আজিকার চড়াইভাতিতে তাহার কোনো যোগ নাই এই ভাবে, সকল উদ্যোগের বাহিরে গিয়া, ম্লানমুখে

সে একস্থানে বসিয়া রহিল। শত চেষ্টাতেও নির্ম্মল আর তাহাকে প্রফুল্ল করিতে পারিল না।

দুধে দাঁত ভাঙিবার পরই শান্তর বিবাহ হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বারতিনেক সে শ্বশুরবাড়ির দেশটা দেখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু শ্বশুরালয়ের সহিত পরিচিত হইলেও স্বামীর সহিত তাহার এখন পর্য্যন্ত পরিচয় হয় নাই। বংশমর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তি দেখিয়া শান্তর পিতা গৌরীশঙ্করকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, পাত্রের বয়সের প্রতি লক্ষ্য করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। ফলে, বিবাহ শান্তর নিতান্ত অসুখের কারণ হইয়াছিল। তাহার পিতামহ-সম বৃদ্ধ পতিকে দেখিলে বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। গৌরীশঙ্কর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া, যে কয়দিন শ্বশুরালয়ে থাকিতেন, সে অস্বচ্ছন্দ-চিত্তে প্রতিবাসিগণের ধানের মরাইয়ে, ঢেঁকশেলের কোণে, গোয়ালঘরের বেড়ার পাশে, লাউমাচার আড়ে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইত। বিবাহের পর, কত সকাল-সন্ধ্যা এইরূপে সে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়া দিত, বহু অনুসন্ধানের পর কেহ না কেহ কোনো না কোনো স্থানে সন্ধান পাইয়া গৃহে লইয়া যাইত। কখনো বা গৌরীশঙ্করকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি হইতে বিদায় করিবার জন্য, পিতামাতাকে

বহু অনুরোধ উপরোধ করিয়াও সফলকাম হইতে না পারিয়া, অবশেষে কান্নাকাটি জুড়িয়া দিত।

গৌরীশঙ্কর তাঁহার তৃতীয় পক্ষের এই নবপরিণীতা পত্নীর অহেতুকী ভয় দেখিয়া, সুযোগ পাইলেই তাহাকে বিবিধপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেন! কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ উন্নতকায় গৌরীশঙ্করের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন হইতে বহুকষ্টে নিজেকে মুক্ত করিয়া গৌরাঙ্গী বালিকা, তাহার সুবর্ণ পুষ্পপাত্রে নীল নলিনীবৎ নয়নদুটি চম্পকাঙ্গুলির দ্বারা আবৃত করিয়া সমীরণান্দোলিত গোলাপ-পাপ্ড়ির মত ঠোঁট দুখানি কাঁপাইয়া বলিত—"ওগো তুমি চলে যাও; আর এসো না; আমাদের বাড়ি আর এসো না।"

গৌরীশঙ্কর তাহার এই অনুচিত ব্যবহারে রুষ্ট না হইয়া, তাহার দেবী প্রতিমার মত অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তিখানি দূর হইতে দেখিবেন, কি তাহার মধুরস্পর্শে সদ্যঃ পত্নীশোক-সন্তপ্ত বক্ষ শীতল করিবেন, ঠিক করিতে পারিতেন না। তাঁহার মোহের ঘোর কাটিবার পূর্ব্বেই শান্ত তাহাদের কুটীরের বাহিরে আসিয়া চঞ্চল-গতিতে ধান্যক্ষেত্র পার হইয়া কৃষকগৃহে আশ্রয় লইত। দৈবাৎ মা অথবা পিসিমার সম্মুখে পড়িলেই নির্দ্দয় চপেটাঘাতে তাহার

পৃষ্ঠদেশ পাঁচ পাঁচটি অঙ্গুলির চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া তাঁহারা তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতেন। পল্লীরমণীদের কৌতুক বাড়াইয়া, প্রহার-জর্জ্জরিত পৃষ্ঠের যাতনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শান্ত যখন গৃহে ফিরিত, গৌরীশঙ্কর লজ্জিত ও দুঃখিত-চিত্তে ভাবিতেন যতদিন না ওর বুদ্ধি হয়, আর শ্বশুরবাড়ি আসিব না। কিন্তু বাড়ি ফিরিবার সময়, স্বয়ং শ্বশুর মহাশয় যখন নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত বলিয়া দিতেন—"আগামী পার্ব্বণ-উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্র গেলে একটু কষ্ট স্বীকার করে এসো বাবা, অন্যথা ক'র না,"—তখন শ্বশুর অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ জামাতা বাধ্য পুত্রটির মত বিনীতভাবে, "যে আজ্ঞা" ব লয়া প্রস্থান করিতেন। আর গৌরীশঙ্কর তাহাদের গ্রাম পার হইতেই দ্বিগুণ উৎসাহে শান্ত আবার ছুটাছুটি লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দিত ও এলোচুলে অপরিচ্ছন্ন বেশে কাদামাটি লইয়া দিব্য মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইত। তাই জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে গৌরীশঙ্করের আগমন আজ সদ্য-হাস্যময়ী বালিকার বিষণ্ণতার কারণ।

আজিকার বনভোজনের অয়োজনটা খুব বেশী রকমেরই হইয়াছিল। নির্ম্মল ও শান্তর আগ্রহে এ-আমোদে যোগ দিবার জন্য গ্রামের প্রায় সকল বালিকাই

পুষ্করিণী-তীরে ফলভারে অবনত আম্রবৃক্ষটির সুবিস্তীর্ণ ছায়ায় একত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু শান্ত না থাকিলে নির্ম্মলের সকল আমোদ নষ্ট হইবে, সুতরাং, বহু সাধ্য-সাধনা মান-অভিমানের পর নির্ম্মল শান্তকে ফিরাইয়া আনিল।

সারা দিবসব্যাপী হাস্যামোদের মধ্যে বালিকাগণের বন-ভোজন ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল, কেবল পতি-আগমন-বার্ত্তায় উদ্বিগ্না শান্ত এবং বন্ধুর হঠাৎ বিষণ্ণতায় ক্ষুণ্ণমনা নির্ম্মল আজি পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পরদিন নির্ম্মল তাহার বন্ধুর বরকে দেখিতে আসিয়াছিল ; বন্ধুর ভগিনী স্নানান্তে ইস্টদেবের পূজারত গৌরীশঙ্করকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলে, অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত নির্ম্মল সহসা বলিয়া ফেলিল,—“বাঃ ও বুঝি বর, ও তো বুড়ো !”

তাহার উক্তি শুনিয়া গৃহস্থ সকলে হাসিল, আর গৌরীশঙ্কর সময়ান্তরে তাহার সহিত আলাপ করিবেন ভাবিয়া, কৌতূহল দৃষ্টিতে তাহাকে একনজর দেখিয়া লইলেন। ঘরশুদ্ধ লোকের হাসিতে লজ্জা পাইয়া নির্ম্মল ছুটিয়া পলাইল। বিস্মিতা বালিকার উক্তি গৌরীশঙ্করের কাণে ও প্রাণে মিষ্টস্বরে বাজিতে লাগিল।

পরদিন তিনি শান্তর ছোট বোনের দ্বারা নির্ম্মলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নির্ম্মল আসিল। বন্ধুর অনুরোধে পড়িয়া সেইসঙ্গে শান্ত ও আসিল।

দুই চারিদিনের মধ্যেই বন্ধুর বরের সহিত নির্ম্মলের বন্ধুত্ব হইল। নির্ম্মল নিকটে থাকায় শান্ত এবার কান্নাকাটি করিল না, কিন্তু পুরাতন ছাড়িয়া নূতন সুর

ধরিল। সে সুবিধা পাইলেই গৌরীশঙ্করের নস্যাধার হইতে নস্য ফেলিয়া চূণ সুরকিতে পূর্ণ করিয়া,—কামিজের বোতাম খুলিয়া আমবাগানে ফেলিয়া দিয়া,—কুঞ্চিত উড়ানিখানিতে কচুর আঠা লাগাইয়া,—খাপ হইতে চুপি চুপি চসমাখানি বাহির করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া,—বিধিমত প্রকারে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; নির্ম্মল তাহার শিক্ষায় উৎসাহিত হইয়া চূণ বালি দ্বারা সাজা পান খাওয়াইয়া, জলের গ্লাসে লবণ মিশ্রিত করিয়া, ধ্যানমগ্ন গৌরীশঙ্করের সম্মুখ হইতে ফুল গঙ্গাজল সরাইয়া লইয়া বন্ধুর বিশেষ সাহায্য করিল।

গৌরীশঙ্কর বালিকাদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া বরং প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সাধের গৃহলক্ষ্মীটি এবার তাঁহাকে জুজুর মত ভয় না করিয়া বরং বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

নির্ম্মলের মধ্যস্থতায় শান্তর একটু ভয় ভাঙ্গিল, সুতরাং পরমানন্দে বৃদ্ধ গৌরীশঙ্করও বালিকা নির্ম্মলনলিনীর অকৃত্রিম বন্ধু হইলেন। মহাহর্ষে নির্ম্মলের দিন কাটিতে লাগিল। পল্লীগ্রামে আসিয়া নির্ম্মলের লাভ হইল,—

অপ্রত্যাশিত দুটী বন্ধু ও মামীমা ইন্দুমতীর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্য।

ইহার পূর্ব্বে আর কখনো নির্ম্মল পল্লীগ্রামে আসে নাই; সুতরাং এখানকার সকলই তাহার চক্ষে নূতন, সুন্দর, বিস্ময়কর। জন্মাবধি দেখিয়া শুনিয়া যাহার মধ্যে শোভা বা বিস্ময়ের কিছু নাই ভাবিয়াছিল, সে সকলেই বন্ধুর অসীম প্রীতি দেখিয়া শান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কি দেখাইয়া শুনাইয়া বেড়ায়, নিশিদিন বন্ধুর চিত্তবিনোদন করিতে কতই না চেষ্টা করে। প্রতিদানে নির্ম্মল কলিকাতা বেড়াইতে যাইবার দিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, সার্কাস, বায়স্কোপ প্রভৃতি এক একবার এক এক রকম দেখাইয়া পুলক-বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেয়।

মামাবাবু ও মামীমার নিকট নির্ম্মল যখন নিয়মিত পাঠানুশীলন বা গীতবাদ্য শিক্ষা করে, প্রশংসমান দৃষ্টিতে শান্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া নিজের বর্ণপরিচয়খানি হাতে লইয়া বসিয়া থাকে, ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবে আমি কিছুতেই বন্ধুর যোগ্য নহি। কোনোদিকে কোনো প্রকারে বন্ধুর যোগ্য নয়, তবু তাহার বন্ধু তাহাকে কত ভালবাসে ভাবিয়া নির্ম্মলের প্রতি তাহার ভালবাসা শতগুণে বর্দ্ধিত

হয়, আর প্রাণপণে সে বন্ধুর যোগ্য হইবার চেষ্টা করে।

আজন্মের বাসভূমি ও সঙ্গিনীদের ছাড়িয়া আসিয়াও যাহার সঙ্গ ও সৌহার্দ্দগুণে নির্ম্মল এতদিন অপুর্ব্ব আনন্দে বিভোর হইয়াছিল, সেই শান্ত একদিন তাহার কাছে বিদায় প্রার্থনা করিল!

বর্ণপরিচয়খানি শেষ হইবার পূর্ব্বেই শান্তর শ্বশুরবাড়ি হইতে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল। অনেক কান্নাকাটির পর নিতান্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে শান্ত পাল্কীতে উঠিল। শান্তর নিকট বহু প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া রোরুদ্যমানা নির্ম্মল বড় অনিচ্ছায় বন্ধুকে বিদায় দিল।

এই অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদে দুটি কোমল প্রাণে কতখানি ব্যথা লাগিল সাংসারিক মানব তাহা বুঝিল না। নির্ম্মলের হর্ষরঞ্জিত মুখখানিতে বিষাদছায়া আঁকিয়া এই শোভা-সম্পৎপূর্ণ আনন্দময় গ্রামখানির সুখ, শান্তর সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলের নিকট কেমন ধীরে ধীরে বিদায় লইল কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।

এদিকে শান্তর অভাবে নির্ম্মলের যেমন অশান্তি বোধ হইল, ওদিকে শান্তও বন্ধুর জন্য নিশিদিন ছট্‌ফট্ করিতে

লাগিল। শ্বশুরালয়ে শত স্নেহাদরেও তাহার মনে তৃপ্তি আসে না। সে কারাবদ্ধা বন্দিনীর মত কেবল উদ্ধারের নানা উপায় চিন্তা করে। চারিদিক্ ঢাকা প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানা তাহার খাঁচার মত মনে হয়, একস্থানে শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে, মনে দারুণ অশান্তি আসে। জনহীন ঘরের মধ্যে সে অনাবশ্যক ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদে।

গৌরীশঙ্কর তাহাকে প্রফুল্ল করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও হতাশ হন, তাঁহার আদর যত্নের প্রতিদানে সে কেবল কয়েকবিন্দু অশ্রু উপহার দিয়া তাঁহাকে ব্যথিত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। গৌরাশঙ্কর বুঝিতে পারেন বনের হরিণী বনে বনে মনের আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতে পাইলে সুখী হয়, স্বর্ণপিঞ্জরে মণিময় শৃঙ্খলে সে বদ্ধ থাকিতে চায় না।

* * * * *

ক্রমে জগৎবাবুর অবসরকালেরও অবসান হইয়া আসিল। তখনও শান্ত শ্বশুরালয় হইতে আসিল না। শান্তকে এখন আর তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। শান্ত এখন বড় সংসারের বউ, তাহার স্বামী বাড়ির

কর্ত্তা—বহু পরিজনের প্রতিপালক ; গৃহে শাশুড়ী নাই, ননদ ক্রমেই বৃদ্ধা হইতেছেন ; তাঁহার ইচ্ছা সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসিনী হইয়া একান্তমনে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া শান্তকে তিনি এই বৃহৎ সংসারের উপযুক্ত গৃহিণীপনা শিখাইয়া দেন। এখন হইতে নিজের কাছে না রাখিলে তাঁহার এ আশা পূর্ণ হয় না, সুতরাং শান্তর পিতা কন্যাকে আনিতে গিয়া দুইবার ফিরিয়া আসিলেন।

গৌরীশঙ্কর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতের উপর অন্যমত প্রকাশ করিতে না পারিয়া পরে নিজে সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিবেন বলিয়া শান্তকে আশ্বাস দিলেন ; গৌরীশঙ্করের সহানুভূতি-সূচক বাক্যে শান্ত কতক পরিমাণে আশ্বস্তা হইল। সে দেখিল, যাঁহাকে গ্রামে প্রবেশ কবিতে দেখিলে সে গৃহ হইতে পলায়ন করিত, যাঁহাকে সে দু'চক্ষের বিষ দেখিত, এখন এই কারাগারে তাহার দুঃখে সহানুভূতি-শূন্য চারিদিকের এই অচেনা অজানাদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর বরং তাহার আপনার,—তাহার দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী।

বন্ধুর আসার আশায় হতাশ হইয়া নির্ম্মল যখন ভাবিতেছে,—তবে বুঝি বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হইল না,—

সেই সময় সহসা একদিন শান্ত আসিয়া তাহার স্নেহালিঙ্গনে ধরা দিয়া তাহাকে আশাতীত আনন্দ দান করিল।

সে শুনিল, শান্তর করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া গৌরীশঙ্কর নিজেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। কৃতজ্ঞ-অন্তরে সহাস্যমুখে নির্ম্মল বন্ধুর বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছুটিল।

শান্ত আসিল, কিন্তু নির্ম্মলদের তখন গ্রামত্যাগের আর অর্দ্ধসপ্তাহ মাত্র বাকি! কত আকাঙ্ক্ষার পর প্রার্থিত দিন আসিল কিন্তু এমন অসময়ে! শান্ত ত কাঁদিয়াই আকুল! সে পাগলী মেয়ে বলিয়া বসিল,—"আর সকলে যান, বন্ধুকে আমি যেতে দেবো না; আমিও আর শ্বশুর-বাড়ি যাবো না।"

এক একটা দিন এক এক নিমেষের মত কাটাইয়া নির্ম্মল শান্তর নিকট বিদায় চাহিল।

আবার সেই মোটর-গাড়ি একখানা বাগানের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার আর বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে নয়—অশ্রুজলে দৃষ্টিহারা হইয়া শান্ত ও নির্ম্মল পরস্পরের নিকট বিদায় লইল। একশ' মাথার দিব্য দিয়া শান্ত বলিয়া দিল,—"এসো বন্ধু আর একটিবার এসো, ভুলো না!"

বিদেশী লোক বিদেশে চলিয়া গেল, ইহাতে আর

কাহারো বড় এল গেল না, বালিকা শান্তই একা বন্ধুর বিচ্ছেদ-বেদনায় ব্যথিত হইতে লাগিল। তাহাদের কুটীর-পার্শ্বের শূন্য বাগান-বাড়িটা, সারা গ্রামখানা শতবার শতরূপে বিদেশিনী বন্ধুর স্মৃতি জাগাইয়া যেন বলিতে লাগিল—নাই গো নাই, আজ সে নাই। শান্তর মনে হইতে লাগিল, এই বুঝি শেষ; জীবনের আর বুঝি সে তাহার বন্ধুর দেখা পাইবে না, সে হাসি সে গান সে মধু-মাখা কথা আর সে শুনিতে পাইবে না। শান্ত যত ভাবে ততই তাহার প্রাণ ব্যাকুল হয়, নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠে, সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় আর গোপনে চোখের জল মুছে।

প্রবাসী জগৎবাবু নির্ম্মলকে কলিকাতায় রাখিয়া স্বাস্থ্যলাভে হৃষ্ট ইন্দুমতীকে লইয়া কর্ম্মস্থান মিরাটে ফিরিয়া গেলেন। বিদ্যালাভাশায় নির্ম্মল আত্মীয়বন্ধু হইতে দূরে শিক্ষয়িত্রীদিগের তত্ত্বাবধানে ছাত্রী-আবাসে থাকিয়া ছাত্রী জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে আরম্ভ করিল।

দীর্ঘ দুটি বৎসর অনুক্ষণ যাহারা পরস্পরের সাথী হইয়াছিল, সেই বন্ধুদ্বয়ের মাঝে নদী, বন, গ্রাম নগরের ব্যবধান পড়িল! ভবিষ্যতে কখন এই স্মৃতি মধুর গ্রাম-খানিতে বেড়াইতে আসিয়া শান্তর পিত্রালয়ে সাক্ষাৎ

পাওয়া ভিন্ন লিখনানভিজ্ঞা শান্তর নিকট হইতে নির্ম্মলের একখানি পত্রেরও আশা রহিল না।

নির্ম্মল শৈশবে মাতৃহীনা। পিতা জীবিত আছেন কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানাদি লইয়াই ব্যস্ত, নির্ম্মলের সংবাদ রাখিবার তাঁহার অবসর বা আবশ্যক হয় না। নির্ম্মল্ অতি শৈশবে মাতার মৃত্যুশয্যায় একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিল মাত্র, পিতার যত্নাদর পাওয়া কোনো দিন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু জন্মাবধি মাতুলের যত্নাদর যে পরিমাণে সে পাইয়া আসিতেছিল; মামীমার নিকট যে অতুল মাতৃস্নেহ উপভোগ করিতেছিল তাহাতেই সে তৃপ্ত ছিল, পিতামাতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। মামা মামী নির্ম্মলের পিতামাতার ও নির্ম্মল তাঁহাদের সন্তানের স্থান অধিকার করিয়াছিল, কাহারো মনে অভাবজনিত কিছু ক্লেশ—কোন ক্ষোভ ছিল না। এখানে আবার শান্তর মত অকৃত্রিম বন্ধু তাহার ভগিনীর স্থান পূর্ণ করিয়াছিল। তাই শান্তর বিচ্ছেদ অনেকটা মামা মামার বিচ্ছেদের মতই নির্ম্মলকে অশান্ত ব্যথিত করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বভাব ও অধ্যবসায়গুণে নির্ম্মল, আত্মোন্নতি এবং বিদ্যালয় ও ছাত্রী আবাসের সকলেরই স্নেহ প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ছাত্রীদের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। এখানেও সে কয়েকটি অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিল কিন্তু এই জ্ঞানে গুণে উন্নত বন্ধু দলের মাঝে, সরলা শান্তর স্মৃতি নিশিদিন তাহার অন্তরে জাগিতে ছিল; তাহার বন্ধু বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয় শান্তর দর্শনাশায় উন্মুখ হইয়াছিল, সে তাহার প্রতিজ্ঞামত একবার শান্তর পিত্রালয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সুযোগ ও মাতুলের অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কোনমতেই নির্ম্মল এ সুযোগ করিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমেই যেন অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য্য হারাইতেছিল।

ছাত্রীজীবনের প্রথম চারি বৎসর, মাতুলের আদেশে গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটীতে নির্ম্মলকে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়িকার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিশেষ কোনো অনাথালয় ও পীড়িতা-শ্রমে গিয়া মনোযোগের সহিত শিশুপালন ও রোগীর

শুশ্রূষা করিয়া ঐ দুই বিষয়ে আবশ্যক মত জ্ঞান লাভ করিতে হইল। সে তাহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের অবসর পাইল না। পঞ্চম বৎসরের ছুটীর দিনগুলিতে সে যখন রন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিতে আদিষ্ট হইল, সেই সময়ে সে আর পরবর্ত্তী সুযোগের অপেক্ষা না করিয়া, তাহার নূতন শিক্ষা আরম্ভের পূর্ব্বেই, বহু অনুরোধে সম্মত করিয়া, একদিন ছাত্রী-আবাসের তিন চারিজন ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীর সহিত শান্তকে দেখিতে গেল।

আবার নির্ম্মল তাহার বহু স্মৃতি-জড়িত, সেই অপূর্ব্ব শ্যামল শ্রীমণ্ডিত শস্যক্ষেত্র-শোভিত কৃষক-পল্লী-প্রধান গ্রামখানিতে পদার্পণ করিল। সহরের ছাত্রী-আবাসের ছাত্রীরা গ্রামের মধ্য দিয়া প্রাতঃকালীন শোভা দর্শনে নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবে বলিয়া, পল্লীর বাহিরে গাড়ি রাখিয়া শিক্ষয়িত্রীর সহিত হাঁটিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু শান্তর সহিত সত্বর মিলনের প্রবল আগ্রহ নির্ম্মলকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। মন্থরগতি সঙ্গিনীদের মাঝে তাহার গতি, ক্ষেত্র-পার্শ্বের অরুণালোকোদ্ভাসিত নদীজলেরই মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মনের আনন্দ নয়নের দ্বার দিয়া প্রতিক্ষণে প্রতিমাদর্শনোৎসুক কৃষক-শিশুর মতই ছুটিয়া

বাহির হইতেছিল; তাহার হর্ষ হাসি, প্রভাত-প্রসূনের সুবাসেরই মত নীরবে সঙ্গিনীদের চিত্তে আনন্দানুভূতি জাগাইতেছিল।

আশ্বিন মাস, সপ্তমী পূজার দিন,—শান্ত নিশ্চয়ই পিত্রালয়ে আসিয়াছে; নির্ম্মল যে আজ আসিবে শান্ত তাহা স্বপ্নেও জানে না। এত বৎসরের পর আজ নির্ম্মল যখন তেমনি আনন্দে, তেমনি আগ্রহে আসিয়া শান্তকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিবে হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত মিলনে শান্তর কতখানি আনন্দ হইবে; আনন্দের আবেগে সে কি করিবে, কি বলিবে; তখন বন্ধুর হর্ষরঞ্জিত মুখখানি কত সুন্দর দেখাইবে; তাহারই স্কুলের এই শিক্ষাভিমানিনী বন্ধুত্রয় অশিক্ষিতা পল্লীবালার বিনয়-নম্র ব্যবহারে কত তৃপ্তি পাইবে, তাহার অকপট সরলতায় কেমন মুগ্ধ হইবে, নির্ম্মল মনে মনে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে কল্পনায় কত আনন্দপ্রদ চিত্র আঁকিতে আঁকিতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

একে একে ক্ষেত্র, মাঠ, উপবন কুটীর পশ্চাতে রাখিয়া,—যেখানে সে তাহার বাল্যজীবনের দুটি সুখময় বর্ষ যাপন করিয়াছে যেখানে সে তাহার বন্ধুর অগাধ স্নেহ প্রীতি লাভ করিয়া ভগিনীর অভাব ভুলিয়াছে, যেখানকার

প্রতি স্থানটুকুতে প্রতি বৃক্ষলতাপুষ্পটিতে তাহার শত সুখ-স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে, যেখানকার বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীরা সুধাস্বরে বৃক্ষ-লতাদল পুষ্পমুখের মধুর হাস্যে পুরাতন বন্ধু বলিয়া তাহাকে সাদর আহ্বান করিতেছে সেই পরিচিত উদ্যান-ভবনের নিকটস্থ হইল। আর একটু গেলেই উদ্যান-পার্শ্বে রামনাথ ভট্টাচার্য্যের শান্তিকুটীর—শান্তর সুখের পিত্রালয়। নির্ম্মলের বিপুল আনন্দ হৃদয়ের কূল ছাপাইবার উপক্রম করিল, তাহার গতি দ্রুততর হইয়া উঠিল!

উদ্যান পার হইলেই বন্ধুর দর্শন পাইবে—স্বল্প কথায় সঙ্গিনীদের বুঝাইয়া দিয়াই আগ্রহব্যাকুল-কণ্ঠে নির্ম্মল ডাকিল—"বন্ধু"—'ভাই শান্ত'—'বন্ধু-মা'—'বন্ধু মা'—!

কিন্তু যে আশায় যে আনন্দে হৃদয় উল্লসিত, নয়ন সমুজ্জ্বল, গতি দ্রুততর, নির্ম্মলের সে আনন্দ সে আশা পূর্ণ হইল কই?

কোথা বন্ধু? কোথা তাহার সুখের পিত্রালয়, কোথায় বা তাহার বন্ধুর জননীর প্রীতিপ্রফুল্ল আননের মধুর সাদর সম্ভাষণ!

শান্ত! শান্ত! কোথা শান্ত? হায়! বাঞ্ছিত ক্ষণ আসিল বাঞ্ছিতের দর্শন মিলিল কই? নির্ম্মলের

সহাস্য মুখ মলিন হইল ; কণ্ঠে জড়তা, দেহে অবসন্নতা আসিল। বিস্ময়ে বিষাদে নির্ম্মল দেখিল—শান্ত নাই, তাহার পিতার পর্ণকুটীরের চিহ্নমাত্র নাই ; প্রকাণ্ড একটা জঙ্গলময় মৃত্তিকাস্তূপের কাছে শিউলি ফুলের গাছটি কেবল এখনো তখনকার দিনের মত অজস্র পুষ্প বর্ষণ করিয়া শান্তর জন্মভূমিকে চিহ্নিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! নির্ম্মল আপন নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না—সত্যই কি তাহার বন্ধু নাই, বন্ধুর আত্মপরিজন উদ্যান কুটীর কিছুই নাই—সকলি গিয়াছে ; আছে কেবল বন্ধুর আনন্দময় বাসগৃহের চতুঃসীমা ঘিরিয়া ভীষণ বিজনতা, দারুণ শূন্যতা আর নিরাশার ঘনান্ধকার!

নির্ম্মলের আগমনবার্ত্তা পাইয়া, পরিচিত গ্রামবাসিনীদের মধ্যে কয়েকজন ছুটিয়া আসিল, তাহারাই তাহাকে অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে তাহাদের পুরোহিত ঠাকুরের সর্ব্বনাশের কাহিনী শুনাইল।

নির্ম্মল বুঝিল তাহাদের গ্রামত্যাগের কিছুদিন পরেই গ্রামে মড়ক দেখা দেয়, উপযুক্ত চিকিৎসক ও যত্ন শুশ্রূষার অভাবে বহু গ্রামবাসীর সঙ্গে শান্তর পিতা, পত্নী ও শিশু পুত্রের সহিত, অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। শোকাতুরা

বিধবা ভগিনী উপায়ন্তর না দেখিয়া,—ভ্রাতার পুত্র-কন্যাগুলি ও রঘুনাথ দেবের বিগ্রহটি লইয়া আপন শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। তদবধি এ গ্রামের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, তাঁহাদের আর কোনো সংবাদ সন্ধানও তাহারা জানে না।

সুনামের সহিত একে একে নিম্ন পরীক্ষাগুলি পাস করিয়া, যথাসময়ে নির্ম্মল প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া য়ুনিভার্সিটির প্রথম বৃত্তি লাভ করিল। তাহার প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রিগণের স্নেহ-যত্নের অবধি রহিল না। বন্ধুদের মধ্যে কেহ তাহাকে এফ-এ পড়িতে উৎসাহিত করিল, কেহ বা ক্যাম্বেলে ভর্ত্তি হইতে পরামর্শ দিল। মামীমা একখানি সোহাগ-মাখা পত্রে তাহার আদরের 'রাণুমা'র অভিনন্দন করিলেন; মামাবাবু সানন্দে এইবার তাঁহার স্নেহপাত্রী নির্ম্মলনলিনীর যোগ্য-পাত্রের অনুসন্ধানে অধিকতর মনোযোগী হইলেন।

শেষে এফ-এ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া কলেজের সকল পরীক্ষাগুলি পাস করিবার পর ভগিনী ডোরা, কুমারী নাইটিঙ্গেল, কুমারী তরুদত্ত অথবা পণ্ডিতা রমাবাইএর মত কোনো একজন হইবার, কোনো একটা কিছু মহাকর্ম্ম সাধিবার উচ্চ আশায় নির্ম্মল যখন উৎফুল্ল, সেই সময়

তাহার মামাবাবু তাহাকে সহসা কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সংসারাশ্রমে পাঠাইলেন।

বধূবেশিনী নির্ম্মল শ্বশুর-ভবনে পদার্পণ করিতেই চৌদিকের হর্ষকোলাহলের মধ্যে সহস্র উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে তাহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া পরিচিত কণ্ঠে কে একজন কৌতুক হাস্যের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাই নির্ম্মল চিনতে পার ?"

দৃষ্টিমাত্রেই নির্ম্মল তাহার বন্ধু প্রতিভাকে চিনিল। চারিদিকে বহু অজানা অচেনার মাঝে এই পরিচিত মুখখানি দেখিতে পাইয়া স্মিতমুখে প্রসন্ন নয়নে সে তাহার দিকে চাহিল। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রতিভা বলিল, "এখন জান আমি কে ? আমি তোমার কল্যাণীয়া কনিষ্ঠা ননদিনী আর তুমি আবার পরম পূজনীয়া বড় বধূ ঠাকুরাণী !"

প্রিয়বন্ধু প্রতিভার নূতন পরিচয় পাইয়া নির্ম্মলের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল! নির্ম্মল বুঝিল, তাহার নিমিত্ত মামাবাবুর নির্ব্বাচিত বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রে সুন্দর সৎপাত্র আর কেহ নহে—তাহাদের কলেজের অন্যতমা ছাত্রী প্রতিভাকুমারীর জ্যেষ্ঠ সহোদর মুন্সেফ হেমন্তকুমার। ছাত্রা-আবাসে থাকিতে নির্ম্মল প্রতিভার নিকট বহুবার

যাঁহার গুণকাহিনী শুনিয়া আনন্দানুভব করিয়াছিল, সেই হেমন্তকুমারকে স্বামী ও প্রিয়বন্ধু প্রতিভাকে স্নেহময়া ননদিনা জানিয়া নির্ম্মল যেন অনেকটা আশ্বস্তা হইল। তবু শান্ত যে বলিয়াছিল 'শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘোমটা দেওয়া সে ভাই এক যন্ত্রণা," নির্ম্মল এখন বুঝিল কথাটা বড় মিথ্যা নয়, বিশেষ তাহার পক্ষে। জীবনের পনেরোটা বৎসর শিশুসুলভ চাপল্যের সহিত খোলা মাথায় খোলা হাওয়ায় বেড়াইয়া হঠাৎ একেবারে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া গৃহকোণের রুদ্ধ বায়ুতে দিবসের পর দিবস কাটাইয়া লজ্জাশীলা নাম কেনা বড় সহজ কথা নহে। ক্রমে সে আরো বুঝিল "স্কুলরুম" বা "বোর্ডিং হাউস" হইতেও এখানে তাহার সুনাম অর্জ্জনের জন্য অধিক শিক্ষা, সংযম ও সতর্কতার আবশ্যক!

প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে আইন কানুন শিক্ষা ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি অভ্যাসের সময় যতই অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল ততই তাহার মামাবাবুর উপর অভিমানটা গিয়া পড়িতে লাগিল,—কেন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন—চিরকুমারী রাখিয়া তাহাকে কি তাহার আশা ও আদর্শানুযায়ী জীবন লাভ করিতে দিতে পারিতেন না?

যাহা হউক একটা মহৎ আত্মোৎসর্গের কল্পনায় বাধা

পাইয়া প্রথমটা একটু খুঁত খুঁত করিয়া অবশেষে আপন মধুর প্রকৃতি ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে গুরুজনের স্নেহযত্ন কনিষ্ঠদের প্রীতি শ্রদ্ধা ও সর্ব্বোপরি হেমন্তর অতুল প্রেমাদর লাভ করিয়া নির্ম্মল ভাবিল—সংসারাশ্রমটাও কিন্তু মন্দ নয়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হেমন্ত কর্ম্মস্থানে যাইবে, নির্ম্মল তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, আয়না, ব্রুস, সাবান এসেন্স ছোট বড় জিনিস-গুলি ট্রাঙ্কে গুছাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, আর মৃদুভাবে অনুভব করিতেছিল বিচ্ছেদের পূর্ব্ব হইতেই বিরহের বেদনা! নির্ম্মল মনে মনে নানা যুক্তি তর্ক অনুমান অনুভব দ্বারা তুলনায় শান্তর বিচ্ছেদ, মামা মামার অদর্শনের সহিত ভাবী পতি-বিরহের গুরু লঘুত্বের বিচার করিতেছিল,—এমন সময় একখানি পত্র হস্তে হেমন্ত স্মিতমুখে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "নির্ম্মল, একটা সুখবর আছে; পুরস্কারের আশা পেলে এক নিশ্বাসে বলে ফেলতে পারি।"

নির্ম্মল মস্তকে ঈষৎ অঞ্চল টানিয়া মৃদুহাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"খবরটা কি শুনি?"

হেমন্ত উচ্চারিত বাক্যের প্রতিশব্দে কৌতূহলের সুর মিলাইয়া উত্তর করিল,—"এক সপ্তাহ—নির্ম্মল, আর এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের বিরহের কোনো সম্ভাবনা নাই। এ বসন্তে আরো সাতটি দিন তোমার হেমন্ত তোমার কাছে বন্দী হয়ে থাকবে।"

নির্ম্মল হেমন্তর প্রতি একটি চোরা কটাক্ষ হানিয়া বলিল—"ওঃ এই ? আমি বলি আর কি সুখবর !"

হেমন্ত ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিল—"কেন ? এর চেয়ে ভাল খবর সম্প্রতি তোমার আমার পক্ষে আর কি হতে পারে ? যদিও বেশী নয়—এক সপ্তাহ, তা এই বা পাই কোথা ? আজই যাবার কথা, তা না হয়ে তবু সাতটা দিন !"

নির্ম্মল মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কি উত্তর করিতে যাইতেছিল, হেমন্তর মুগ্ধ দৃষ্টিতে সঙ্কুচিতা হইয়া কোমল কপোলে গোলাপ আভা ফুটাইয়া সলজ্জ নয়ন নত করিল।

প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে হেমন্ত সে সরম-সঙ্কুচিতাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হস্তস্থিত পত্রখানি তাহাকে দিয়া বলিল—"চিঠিখানা পড়ে যত শীঘ্র পার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক, আমি মাকে আর প্রতিভাকে একটু তাড়া দিয়ে আসি।"

নির্ম্মল পত্রে পাঠ করিল—

প্রিয়তম হেমন্ত !

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, তোমার শুভ পরিণয়োৎসবের সুদীর্ঘ গদ্য পদ্যময় নিমন্ত্রণ-পত্রখানি আমার নির্জ্জন কক্ষে এক পাশে অনাদৃতা সুন্দরীর মত

ক্ষুব্ধচিত্তে ধূলি-লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়া আছে। আহা! এমন সুখের দিনে সাধের উৎসবে দুর্ভাগ্য আমি যোগদান করিতে পাইলাম না! কে জানে এতদিন থাকিয়া শেষে আমি যেমন পশ্চিম ভ্রমণে যাইব আর তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া নাত-বৌ ঘরে আনিবে, তা হলে কি এমন সময় ঘরের বাহির হই!

যা হোক্ যে দিন গিয়াছে তাহা তো আর ফিরাইবার নয়; এখন আমার কাছে তোমার নিমন্ত্রণ, বাসন্তী পূজার দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ আগামী পরশ্ব আমার মা জননী, প্রতিভা দিদিমণি ও আমার নূতন নাতবৌটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমার আনন্দ সম্পূর্ণ করিবে। শুধু আমি নয়, স্বয়ং তোমার ছোট ঠাকুমাও বসন্তে হেমন্তর আগমন-প্রতীক্ষায় আছেন জানিয়া, পত্র পাঠ মাত্র আসিবে—অন্যথা করিবে না। সাক্ষাতে অন্যান্য কথা হইবে। গৃহিণীর নাতির বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে না পারার ক্ষোভটা মিটাইবার জন্য, এবার পূজার ঘটার একটু বিশেষ ভাবে আয়োজন করিতে সম্প্রতি আমি বড়ই ব্যস্ত, এ সময়ে তোমার সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়। আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার ছোট্‌ঠাকুর্দ্দা।

পত্রপাঠান্তে নির্ম্মল ঠাকুর্দ্দার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ঠাকুর্দ্দার পরিচয় দিতে হেমন্তর জিহ্বায় সরস্বতী বসিয়া গেল, চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমার অন্তরের পরিচয় দিতে গিয়া বলিল "অন্তরটি তাঁর প্রেমের নন্দন, স্নেহের নির্ঝর সে অতুল স্নেহের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব! আর ঠাকুমা? তিনি তো আর স্বতন্ত্র নহেন, ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমা দুজনে অভিন্নহৃদয়, দুই দেহে একটি প্রাণ, সে আর ব'লে কি জানাব তুমি দেখলেই বুঝবে, ভয় হচ্ছে তখন ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমাকে পেয়ে তুমি শেষে আমাকেই না ভুলে যাও।"

* * * * *

মা বলিলেন,—"হেমন্ত, তুমি একা গেলেই ভাল হ'ত বাছা; এই কলেজে-পড়া বৌঝি নিয়ে পল্লীগ্রামের পূজোবাড়িতে যেতে বাপু আমার সাহস হয় না। কত ভুল চুক দোষ ত্রুটি এদের আমি নিত্যি শুধরে নিই। আমি নিই বলে কি সেখানে তা চলবে? সে পূজোবাড়ি রৈ রৈ থৈ থৈ লোক! হিঁদুর ঘরের ক্রিয়াকাণ্ড, সেখানে আচার বিচারে, কাজ কর্ম্মে একটু ভুল চুক হলে চারিদিকে নিন্দেয় ঢি ঢি পড়ে যাবে। তা ছাড়া সে পাঁচটার বাড়ি, সেকেলে ধরণের লোক তাঁরা, সেখানে তোমাদের এখান-

কার্ এই নুতন ফ্যাসানের চাল চলন চলবে না; কেউ কিছু বললে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হবে। তুমি একলাই যাও বাবা, আমাদের যাওয়া হবে না। খুড়শাশুড়ীকে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, যেতে পাল্লুম না বলে আমাদের যেন অপরাধ নেন না!"

হেমন্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিল—"না মা তা কোনো মতেই হতে পারে না; ঠাকুর্দ্দার নিমন্ত্রণে যেতেই হবে, অন্যথা করলে চলবে না। তোমার বউ না হয় নতুন, প্রতিভা আর আমি তো নতুন নই, আমাদের চালচলন ধরণধারণ তাঁদের কাছে ছাপা নেই, সবই তাঁরা জানেন, তাতে কিছু বাধবে না মা।"

মা প্রতিভাকে লইয়া যাওয়ার সম্বন্ধে আপত্তি তুলিলেন; হেমন্ত বলিল "একটু বড় হয়েছে তাতে আর হয়েছে কি? কুলীনের ঘর আমাদের। শুনিচি কুলীন বর খুঁজতে খুঁজতে গৌরীদান রোহিণীদানের ফল লাভ করা তো হয়েই উঠত না, বরং সময়ে সময়ে কনের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে যেত। তা তখনকার কালে কুলীনের সন্ধান করতে যদি বিবাহের বয়স কাটিয়ে বিবাহ দেওয়ায় কোনো দোষ হত না, এখন একটু লেখাপড়া শেখাতে কি

সুপাত্র খুঁজতে যদি বারো তেরো না হয়ে পনেরো ষোলই হয়, তাতে এমনই কি লজ্জার কথা, অন্যায়ই বা কি ?”

মা হাসিয়া বলিলেন,—“কুলীনবর খুঁজতে দেরী হওয়া, আর কলেজে পড়িয়ে মেয়েকে বুড়ী করে বিয়ে দেওয়া বুঝি এক কথা ? যত সৃষ্টি-ছাড়া কথা, অনাসৃষ্টি মতামত সব তোর কাছে।”

মা আরো দু'চারটি আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হেমন্তর কাছে কোন আপত্তিই খাটিল না, শেষে জননীকে পুত্রের সহিত একমত হইতে হইল। পুত্রবধূকে লইয়া মা পুত্রের সহিত খুড়শ্বশুরের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন। প্রতিভা ঘরেই রহিল, মা কোনো মতেই অত-বড় আইবুড় মেয়েকে সমালোচনার সুবিধার্থে গ্রামের স্ত্রী মহামণ্ডলের সম্মুখীন করিতে সম্মত হইলেন না।

নির্ম্মল শ্বশ্রূর নিকট হইতে নানা আদেশ উপদেশ—পাসের পড়ার মত কণ্ঠস্থ অন্তরস্থ করিয়া এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি কি না পারি ভাবিতে ভাবিতে হাল ফ্যাসানের সাজ-সজ্জাগুলিকে দেরাজের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া হিন্দুগৃহের লজ্জাশীলা নববধূটির শোভনীয় রীতি নীতির বসন ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া শ্বশ্রূর অনুগমন করিল।

বসন্তে গ্রাম তখন নবীন লতাপল্লবে, ফুলমুকুলে সঞ্জীবিত সুরভিত। বিহগ-কাকলীতে ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখরিত। গাড়ীর রুদ্ধ দ্বারের ফাঁকে বাহিরের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নির্ম্মল এমনি সুবাস-সৌন্দর্য্যভরা আর একখানি গ্রামের কথা ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে বিমনা হইয়া পড়িতেছিল, আর শাশুড়ী তাঁহার ক্ষুণ্ণমনা প্রতিভার ম্লান মুখখানি স্মরণ করিয়া অন্তরে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

গাড়ি সিংহদ্বারের সম্মুখে হেমন্তকে নামাইয়া দিয়া খিড়কীতে দিয়া থামিল। একটি হৃষ্ট-পুষ্ট প্রিয়দর্শন শিশুকে কোলে করিয়া একজন পরিচারিকা তাঁহাদের গাড়ী হইতে নামাইয়া সঙ্গে করিয়া গৃহিণার নিকট লইয়া চলিল।

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্বশ্রূর পূর্ব্বশিক্ষামত পায়ের কাছে প্রণামী রাখিয়া নির্ম্মল দিদিশাশুড়ীর পদধূলি লইল। দিদিশাশুড়ীও আশীর্ব্বাদের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ আপন কণ্ঠ হইতে স্বর্ণহার খুলিয়া—এই বুঝি হেমন্তর বৌ—আমার সাধের নাত-বৌ? দেখি ভাই দেখি মুখখানি দেখি একবার—বলিয়া বধূর অবগুণ্ঠন উঠাইলেন। একি! কাহার গলায় হার পরাইতেছি? হরি! হরি! কে

এ? নির্ম্মল ভাবিল কাহার এ মধুময় কণ্ঠস্বর? পুলক-স্পন্দিত হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিল!

অতিমাত্র বিস্ময়ে অভিভূত নির্ম্মল বলিয়া উঠিল—"বন্ধু, তুমি!"

হর্ষবিহ্বল অন্তরে শান্ত উত্তর করিল—"হ্যাঁ বন্ধু আমি"—বহির্ব্বাটী হইতে আগত গৌরীশঙ্করের পশ্চাৎস্থিত হেমন্তকে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিল—"তোমরা ঢুটি নাতি নাত-বৌ সুদিনে আজ আমার ঘরে অতিথি!"

গৌরীশঙ্করকে উপস্থিত দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া শ্বশ্রূ খুড়শ্বশুরের চরণে প্রণাম করিয়া বধূকেও অবগুণ্ঠনবতী হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

বধূ সহাস্যে বলিল—"ওমা! ওঁকে দেখে আমি ঘোমটা দেব কেন? উনি যে আমার বন্ধুর বর!"

নব-বধূর উত্তর শুনিয়া শাশুড়ী তো অবাক্! আদেশ উপদেশ বা জিজ্ঞাসাবাদের স্থান ও কাল এ নয় বুঝিয়া পরিচারিকার নিকট হইতে শান্তর পুত্রটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি একটু অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অনতিদূরে—শিশির-সিক্ত বসোরা গোলাপের পার্শ্বে বায়ু-হিল্লোলিত শ্বেত শতদলের মত আনন্দাশ্রুলোচনা হাস্যাননা শান্তর আলিঙ্গনে হর্ষচঞ্চলা স্মিতমুখী নির্ম্মলের মাধুরী-

মুগ্ধ হেমন্ত এ সময় হাতক্যামেরাটা হাতে না থাকায় এ অপূর্ব্ব-মিলন-দৃশ্যের একটা ফটো লইতে পারিল না বলিয়া মনে মনে আপশোষ করিতে লাগিল—আর এক মুহূর্ত্তে ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বন্ধুদ্বয়ের ফুল্লাননের মধুরিমা দর্শনে প্রীত, রহস্যপ্রিয় গৌরীশঙ্কর নির্ম্মলের বহু-দিন-কথিত বাক্যটি স্মরণ করিয়া, নির্ম্মলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কি গো বন্ধু! আমাকে দেখে তো তোমার পছন্দ হয় নি? বলেছিলে,—"ও বুঝি বর! ও তো বুড়ো"—তা ভাই আমি তো না হয় বুড়ো, আমার নাতিটি তো বর? ওকে পছন্দ হ'য়েছে কি?"—আর হেমন্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ওহে বিচারক ভায়া! বন্ধুর মতে আমি হ'লুম বুড়ো, আর তুমি হ'লে বর, কিন্তু এখন বিচার করে বল দেখি, জিতটা হ'ল কার? বরের, না বুড়োর?"

স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া শান্ত ও নির্ম্মল হাসিয়া উঠিল; পরমানন্দে হেমন্তও সে হাসিতে যোগ দিল,—বৃদ্ধের পুলক-প্রভায় সমুজ্জ্বল স্নেহ-দৃষ্টির তলে, তিনটি তরুণ তরুণীর বিমল হাস্য, যেন প্রয়াগ তীর্থে ত্রিবেণী-সঙ্গমের মত মনে হইল।

অলক্ষণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শোভনাকে চিরদিনই নয়নতারা দেখিতে পারিত না, শুধু নয়নতারা কেন, জগতের অনেকেরই কাছে সে নিতান্ত অপ্রিয় হইয়াই জন্মিয়াছিল! পৃথিবীতে এক রমাদেবী ভিন্ন তাহাকে ভালবাসিবার, তাহার চোখের জল মুছাইবার, তাহার দুঃখে বেদনা বোধ করিবার আর কেহ ছিল না! সকলের অপ্রিয় হইবার কারণ শোভনার ব্যবহারের মধ্যে না থাকিলেও তাহার অদৃষ্টের মধ্যে বিলক্ষণ ছিল। তাই শোভনার মত রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী মেয়ে এ সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

শুনা যায়, শোভনা ভূমিষ্ট হইবার পাঁচ দিন পূর্ব্বে জ্বরবিকারে, তাহার পিতার ও পরদিন তাহার পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছিল—তাই শোভনা যখন পৃথিবীতে আসে,

হাস্যমুখে কেহ তাহার [illegible] নাই, স্নেহের দৃষ্টিতে কেহ তাহার প্রতি চাহে নাই; সে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া অশ্রুপ্রবাহেই ভাসিয়া চলিয়াছিল। একদিনের জন্য [illegible] কাছে টানে নাই, তাহার দুঃখে 'আহা' করে নাই। তাহার প্রভাত-নলিনীর মত সুন্দর সুকুমার মুখখানিতে তাহার মা ভিন্ন আর কেহ কোনদিন একটী স্নেহচুম্বন দান করে নাই! সে সকলের উপেক্ষা অনাদরের মাঝে পুকুরে সাঁতার কাটিয়া—গঙ্গায় ডুব পাড়িয়া—বাগানে ঠাকুরমার পূজার ফুল তুলিয়া—মাঠে ছুটাছুটি খেলিয়া—পুকুর পাড়ে বসিয়া—আকাশে সন্ধ্যার তারা গণিয়া—পুকুরের জলে পূর্ণিমায় চাঁদ ধরিয়া—ঝিঁ ঝিঁ পোকার গান শুনিয়া—আপন মনে হাসিয়া কাঁদিয়া কোন এক রকমে তাহার বাল্য জীবন কাটাইতেছিল। এমন সময় তাহার মা ও ঠাকুরমা যখন গৌরী দানের ফল লাভের প্রত্যাশায় একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন—শোভনার অদৃষ্টটা তখন বড় অশোভন রূপেই প্রকাশ পাইল।

বিবাহের রাত্রে শোভনার শ্বশুর, গ্রামের ডাক্তার মুরারীমোহনের আশ্বাসে—সামান্য অসুখ, দুএক ঘণ্টার মধ্যে সারিয়া যাইবে ভাবিয়া, কন্যাপক্ষের নিকট পুত্রের

অসুখের কথা অপ্রকাশিত রাখিয়াই, রাত্রি দশটার মধ্যে শোভনার সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন। কিন্তু চিরকাল যেমন বিধাতা ও মানুষের ইচ্ছার মধ্যে প্রায়ই বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও তাহাই হইল ; এবং তাহারই ফলে, তিনি ভাবিলেন এক—হইল আর। কন্যা সম্প্রদানের পর নব বর-বধূকে যখন বাসরে বসান হইল, বরের রোগ আর বাধা মানিল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমেই কলেরার লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। বেগতিক দেখিয়া ডাক্তার বাবু কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিলেন, আর তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না। ভাল ডাক্তারের জন্য কলিকাতায় লোক ছুটিল, কিন্তু ডাক্তার লইয়া লোক ফিরিবার আগেই—রাত্রি শেষে শোভনার সুখের দীপ নিবিল !

পতি-পুত্রহীনা বৃদ্ধা ঠাকুরমা যখন পাগলিনীর মত ছুটিয়া, বিবাহ সজ্জায় সজ্জিতা সদ্য বিবাহিতা শোভনার কাছে আসিয়া, নিজের শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"ও পোড়াকপালী ! বাপকে খেয়েছিস্, কাকাকে খেয়েছিস্ আবার একেও খেলি ?" শোভনা তখন কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ঘর ছাড়িয়া উঠানের ভিড় ঠেলিয়া, ছুটিয়া পুকুর ধারে গিয়া জলের দিকে চাহিয়া

বসিয়া রহিল। তারপর কোথা দিয়া সে দিন গেল, কি করিয়া কি হইল কিছুই বুঝিল না, কেবল দিন শেষের ম্লান আলোটুকু যখন আকাশের গায়ে মিলাইতে আসিতে-ছিল, সেই সময়, একবার গগনভেদী উচ্চক্রন্দন ও বিলাপ ধ্বনির সহিত—"বল হরি হরিবোল" শব্দে শোভনার চমক ভাঙ্গিল, সে ফিরিয়া দেখিল কাল যাহারা বিবাহের বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে একটী মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শোভনার আত্মীয়স্বজন হইতে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মত তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিয়া শোভনা শিহরিয়া উঠিল, সেই "বল হরি হরিবোল" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীতিপ্রদ কল্পনা যেন হঠাৎ মূর্ত্তি ধরিয়া চারিদিকের গাছ-পালার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! সে একবার ক্রন্দনের স্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া পুকুরপাড়ে লুটাইয়া পড়িল।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, সে দেখিল—তাহার মা তাহাকে বুকে করিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার চোখের জলে তাহার দেহ সিক্ত হইয়া গিয়াছে। ভালরূপ বুঝিবার শক্তি ফিরিয়া আসিলে দেখিল—তাহার গায়ে সে

নূতন গহনা নাই, পরণে সে লাল চেলি নাই, পূর্ব্বরাত্রের সে মাথাপোরা সিঁদুর, হাতপোরা শাঁখা লোহা নাই, পায়ে সে টুকটুকে আল্‌তা নাই, যেন কে জোর করিয়া ধুইয়া মুছিয়া সব সাদা করিয়া দিয়াছে!

একেত শোভনাকে সকলে অপয়া বলিয়াই জানিত, আবার আজ হইতে তাহার শোভনা নামের সহিত অলক্ষণা নামও অনেকটা যেন অবিচ্ছেদে সংযুক্ত হইয়া রহিল: একেত সে লোকের উপেক্ষা বহন করিয়াই চলিতেছিল, এখন এই ঘটনায় সে লোকের আরও ঘৃণার পাত্রী হইল। সে জানিত কেহ তাহাকে ভালবাসে না কিন্তু, এমন ভাবে কেন সকলে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়, শুভকর্ম্মের দিক হইতে সযত্নে কেন তাকে এত দূরে রাখে, হঠাৎ তাহার নিশ্বাস কাহারও গায়ে লাগিলে কেন এমন শিহরিয়া উঠে, তাহা সে কোন মতেই ঠিক বুঝিতে পারিত না। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, মা কেবল তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আঁচলে চোখ মুছেন, কখন বা পাগলের মত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন, শোভনা শত প্রশ্ন করিয়াও উত্তর পায় না, তবে আর সে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? কে বলিয়া দিবে? আর, কাহার নিকটেই বা সে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে?

কোন দিকেই একটা কুল না পাইয়া শেষে মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়া শোভনা—বাড়ীর কপিলা গাই, মঙ্গলা বাছুর, টিয়াপাখী, টুনি বেরাল আর বাগানের ধারে কাঠবিড়ালীদের নিত্যসঙ্গিনী হইয়া উঠিল। মানুষ যখন অলক্ষণা বলিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়, প্রভাতে উঠিয়া তাহার দর্শন অশুভজনক বলিয়া মুখ ফিরায়—ব্যথিতা কুন্ঠিতা শোভনা তখন কপিলা, মঙ্গলা, টুনি ও টিয়ার নিকটে গিয়া সান্ত্বনা পায়। কপিলা মঙ্গলা তাহার হাত হইতে নরম ঘাস খাইয়া, টিয়া নিম ও বটের ফল ঠোঁটে ধরিয়া, টুনি তাহার কোলে বসিয়া, কাঠবিড়ালা আশে পাশে ঘুরিয়া তাহার কাছে যে নীরব আনন্দ প্রকাশ করে, তাহাতেই শোভনার ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর যখন সে রাত্রে কর্ম্মক্লান্ত জননীর বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, তখন কাহারও ঘৃণা বা অনাদর কিছুই আর তাহার মনে থাকে না।

কিন্তু এ সুখ টুকুও বুঝি তাহার ভাগ্যে সহিল না, ইহার তুই বৎসর পরে শোভনার জগত আঁধার করিয়া তাহার মাতাও তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন। শোভনার আকস্মিক বৈধব্যেই তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া ছিল, ভিতরে ভিতরে ক্ষয় রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম

তিনি রোগটা কাহাকেও জানিতে দেন নাই, শেষ যখন সকলে বুঝিতে পারিল তখন আর প্রতীকারের উপায় ছিল না। এত বড় কঠিন রোগে, একবিন্দু ঔষধও গলাধঃকরণ না করিয়া রোগ যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া নীরবে প্রসন্নমনে তিনি চিরসুহৃদের মত মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শোভনার ভবিষ্যৎ-চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল, তিনি নিশ্চয় বুঝিয়া ছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে এই পিতৃমাতৃহীনা বিধবা বালিকার চোখের জল মুছাইবার সাহস এগ্রামে কাহারও হইবে না, পাছে অলক্ষণার সংস্পর্শে অমঙ্গল ঘটে! তিনি ভাবিলেন শোভনা তাঁহার বক্ষচ্যুত হইয়া দিবাবসানে ম্লান কমলের মত হয়ত বা ঝরিয়া পড়িবে, কেহ তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিবে না। তাই তিনি পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার শৈশব-সঙ্গিনী বিমলার হাত দুটী ধরিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন—"সই! তুই কি আমার অলক্ষণা মেয়েটীকে আমার দুঃখিনী শোভনাকে তোর ঘরে একটু স্থান দিবি বোন্? ওর একটা বিলি না হলে যে আমার মরণেও সুখ হবেনা!" আসন্নমৃত্যু শৈশবসঙ্গিনীর করুণ কণ্ঠের এই কাতর অনুনয়ে বিমলার হৃদয় বিচলিত হইল। কিন্তু তিনি বড়

গৃহস্থের বৌ, তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে পাঁচটা ছেলে মেয়ে বৌ-ঝির মাঝে এই 'খাইকুড়ি' মেয়েটাকে হঠাৎ লইয়া যাইতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

বিমলা যখন সইকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিমলার দিদি রমাদেবী অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া শোভনাকে বুকে টানিয়া বলিলেন —"আয় আমার দুঃখিনীর ধন আমার কাছে আয়। এ পৃথিবীর সকলে যদি ত্যাগ করে, আমি তোকে বুকে ক'রে রাখ্‌ব।" নিবিবার আগে দীপশিখা যেমন একবার তাহার সমস্ত অবশিষ্ট শক্তিটুকুর সহিত জ্বলিয়া উঠে, শোভনার মা'র মুখ তেমনি একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে রমাদেবীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দিদি! তুমি ত মানুষ নও, তুমি দেবী!" তারপর আর কিছুই শুনা গেল না, মুখের হাসি মিলাইতে না মিলাইতে অভাগিনীর প্রাণ বায়ু শূন্যে মিলাইয়া গেল!

রমাদেবী শোভনাকে লইয়া কলিকাতায় তাঁহার আপন ভবনে আসিলেন।

রমাদেবীর গৃহে বড় কেহ ছিল না। তিনি স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, স্বামী তাঁহার অপেক্ষা বয়সে খুব বেশী রকমেরই বড়; সন্তানভাগ্য তাঁহার এমন কিছু ছিল

না। অনেক ডাক্তারি কবিরাজী হাকিমি হোমিওপ্যাথিক ও টোট্‌কা ঔষধ খাইবার পর ঠাকুরের 'দোর ধরিয়া' অনেক বয়সে তাঁহার একটী কন্যা হইয়াছিল, সেই কন্যাই তাঁহার জগতে সুখ, নয়নের আনন্দ। তাই রমা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—নয়নতারা। নয়নতারাকে নয়নান্তরালে রাখা কষ্টকর ভাবিয়া জামাই মেয়েকে চিরদিন যাহাতে নিজের কাছে রাখিতে পারেন এমন দেখিয়া শুনিয়াই তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন সুতরাং মেয়ে জামাই তাঁহার কাছেই ছিল।

শোভনা যখন রমাদেবীর সঙ্গে আসিল, নয়নতারার বয়স তখন সতের আঠার বৎসর। তাহার কোলে তখন একটী খোকা। তাহার স্বামী মন্মথনাথ তখন কলেজে আইন পড়িতেছেন আর পিতা তাঁহার আদুরে নাতিটীর সঙ্গে খেলা করিয়া জীবনের শেষদিনগুলা কাটাইবেন বলিয়া পেন্সন লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

রমাদেবী গৃহে আসিয়াই প্রথমে শোভনার হাতের কাঁচের চুড়িগুলা ভাঙ্গিয়া গিনি সোণার গাছ কয়েক ঝক্‌ঝকে নূতন চুড়ি ও এক ছড়া হার তাহাকে পরাইয়া দিলেন, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত নিজের হাতে সাবান দিয়া ধুয়াইয়া মুছাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নূতন জ্যাকেট্‌

সেমিজ ও সাড়ী পরাইয়া তাহাঁকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া তুলিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সে যে বিধবা, সে যে অলক্ষণা, সেই কথাটা চাপা দিবার জন্য রমাদেবী বিশেষ ভাবে শোভনাকে লইয়া পড়িলেন। শোভনা তাঁহার কাছে আসিয়া এত দিনে প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাইল, যত্নের মিষ্টতা অনুভব করিল। রমাদেবীর বুকে মাথা রাখিয়া শোভনার মাতার বিচ্ছেদ দুঃখ দূর হইল, সে যে অলক্ষণা এ কথাটা যেন অনেকটা ভুলিয়া গেল।

রমার নিকট শোভনার ইতিহাস শুনিয়া ব্যথিত হইয়া কোমলকণ্ঠে স্নেহের স্বরে রমার স্বামী যখন শোভনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি মা?" শোভনার মনে হইল জন্মাবধি এমন ভাবে কেহ তাঁহাকে আর কখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, এতটুকু আদরও সে কখনও পায় নাই। ক্রমে শোভনা রমাকে মা, তাঁহার স্বামীকে 'বাবা' ও নয়নতারাকে 'দিদি' বলিতে অভ্যস্ত হইল, একটু একটু করিয়া তাহার সঙ্কোচ কাটিয়া গেল, আদরে আব্দারে সে রমাদেবীর নিকট নয়নতারার তুল্য হইয়া উঠিল। চিরদুঃখিনী মেয়েটীকে সুখী দেখিয়া স্বামী স্ত্রীতে নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু শেষে

রমা বুঝিলেন একজনের দুঃখ দূর করিতে আর একজনের বুকে ব্যথা লাগিয়াছে। নয়নতারা চিরদিন একলা মানুষ হইয়াছে, পিতামাতার স্নেহ রাজ্যে সে একাই রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে, কোন দিন কাহাকেও কিছুর ভাগ দিতে শিখে নাই। নিজে জন্মাবধি দুঃখ কাহাকে বলে কখন জানে নাই, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কি তাহা কোন দিন বুঝে নাই, সুতরাং, পরের অভাব নিজের মত করিয়া অনুভব করিতে শিখে নাই। তাই রমাদেবীর মুখে শোভনার কাহিনী শুনিয়া তাহার পিতা ও স্বামীর মন যখন করুণায় গলিয়া গেল, নয়নতারা তখন এক বার মমতা বিহীন নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনে মনে ভাবিল—তবে এ অলক্ষণা মেয়েটা আমাদের বাড়ী না এলেই ভাল হত। শোভনার প্রতি স্নেহ ত হইলই না বরং এত বৎসর এক ভাবে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ একা উপভোগ করিতে করিতে হঠাৎ শোভনাকে তাহার ভাগ দিতে হওয়ায় নয়নতারার বড় কষ্ট বোধ হইল। শোভনার আদর দেখিয়া, ভিতরে ভিতরে মনটা তাহার ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল। ইহার উপর আবার বৎসর কয়েকের মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে শোভনার প্রতি নয়নতারা একেবারেই বিমুখ হইল।

নয়নতারার পিতা পেন্সন লওয়ার পর নিরন্তর কর্ম্মহীন ভাবে গৃহে বসিয়া থাকায়, ক্রমেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। শেষে বহুদিন উদরাময়ে ভুগিয়া শীতকালের এক অনুজ্জ্বল প্রভাতে আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া শিব নাম জপ করিতে করিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রমাদেবী এ ঘটনাকে নিজেরই অদৃষ্টের ফল বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু নয়নতারা শোভনাকেই ইহার একমাত্র কারণস্বরূপ মনে করিল। সে ভাবিল, এই অলক্ষণা মেয়েটা বাড়ীতে না এলে বাবা হয়ত আরো বছর কতক বাঁ'চতেন এমনই কি বুড়ো হয়েছিলেন? বাষট্টি বছর বইত নয়, কত লোক যে আশি পঁচাশি বছর অবধি বেঁচে থাকে! মনে যাহাই হউক নয়নতারা মায়ের ভয়ে মুখে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিল না। রমাদেবী পৃথিবীর অত্যাচার হইতে দূরে রাখিবার জন্য শোভনাকে প্রাণপণে নিজের কাছে টানিয়া রাখিতেন, কোনদিক হইতে কোন আঘাতের আশঙ্কা দেখিলেই সুদৃঢ় বর্ম্মের মত তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিতেন। সমাজ সংসার ও স্বার্থের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রমাদেবীর স্নেহ বিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদের মত এই "অলক্ষণা" মেয়েটাকে নিশিদিন ঘিরিয়া থাকিত।

নয়নতারার বিদ্বেষবহ্নি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

কিন্তু সুখ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। তাহার যখন ইচ্ছা তখনই যায়; কাহারও অনুরোধ উপরোধ মানে না, দুঃখ বেদনা বুঝে না—যাহার আশ্রয়ে থাকে, তাহাকে পদদলিত করিয়া যাইবার সময় একবার তাহার মুখের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। শোভনার সুখও চিরস্থায়ী হইল না। তাহার পঁচিশ বৎসর বয়সের সময়—"মা তোর কিছু করে যেতে পারলুম না, যা ভেবেছিলুম তা'র কিছুই হলনা"—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এই কথা কয়টী বলিয়া, নয়নতারার অজ্ঞাতসারে তাহাকে কয়েক শত টাকা ও কয়েকটী অমূল্য উপদেশ দিয়া এবং নয়নতারাকে তাহার প্রতি মমতা করিতে অনুরোধ করা বৃথা জানিয়া, জামাতাকে শোভনার মরণাবধি তাহাকে যত্নে রাখিতে অনুরোধ করিয়া, একদিন বসন্তের নীরব সন্ধ্যায় কন্যা জামাতা ও সাধের নাতি নাতিনীগুলিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, নয়নতারা ও শোভনার ঐকান্তিক সেবা যত্ন বিফল করত রমাদেবী শান্তিময়ের শান্তিধামে চলিয়া গেলেন!

এইবার শোভনা যথার্থই মাতৃহীনা হইল! তাহার আশা উৎসাহ, আনন্দ এবং তৃপ্তিও রমাদেবীর সহিত

চলিয়া গেল। জগত তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইল।

নয়নতারা মাতার মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হইয়া শোভনার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বলিল—"পোড়াকপালী তোর নিজের ত সব খেয়েছিস্ আবার আমার বাপ মাকে খেলি? কি মরণ নেই? ভগবান্ কি তোর মরণ লেখেন নি?"

ভূলুণ্ঠিতা শোভনা অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া ভাবিল হায়! আমার কি মরণ নাই?

দিন কাটিয়াই যায়। শোভনারও দিন একরকমে কাটিয়া যাইতে লাগিল। মৃত্যুকে ত ডাকিলেই পাওয়া যায় না? শোভনার প্রতিদিনের সহস্র ডাকেও মৃত্যু সাড়া দিল না, জীবনও শোভনার দিন দিন অসহনীয় হইতে লাগিল।

রমাদেবীর মৃত্যুর পর মন্মথনাথের অনুগ্রহে এতদিন কোনরকমে শোভনা এ গৃহে টিকিয়াছিল, আজ এক আকস্মিক ঘটনা শোভনাকে আশ্রয়হীনা করিল।

বৈকালে আদালত হইতে মন্মথনাথ নিজের টম্‌টমে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন দৈবাৎ এক সাহেবের গাড়ীর বিষম ধাক্কা লাগায় গাড়ী শুদ্ধ পড়িয়া গিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। নিকটেই এক ভদ্রলোকের গৃহে তাঁহাকে

শয়ন করাইয়া অনেকে তাঁহার শুশ্রূষাদিতে নিযুক্ত হইলে সহিস্ ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে ও বাড়ীতে খবর দিতে গেল।

সন্ধ্যার পর আহত স্থানে পটী বাঁধা অর্দ্ধ অচৈতন্য মন্মথনাথকে যখন পাঁচজনে ধরাধরি করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া গেল, নয়নতারা স্বামীর সেই দুঃখজনক অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—"ওগো আমার কি হলো গো।"—বলিয়া উপরের বারান্দায় আছাড় খাইয়া পড়িল। শোভনা নয়নতারার ছোট ছেলেটীকে কোলে করিয়া ছাদে গিয়াছিল, মন্মথনাথের আগমন সংবাদ পাইয়া, বিষণ্নমুখে ছাদ হইতে নামিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার ঘরের দিকে গেল। চৌকাটে পা দিতেই নয়ন তারা ছুটিয়া আসিয়া বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া শোভনার কোল হইতে ছেলে টানিয়া লইয়া চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল—"ও রাক্ষসী তুই আর ঘরে ঢুকিস্‌নি—বেরো—বেরো—অলক্ষণা বাড়ী থেকে বিদায় হ।"

নয়নতারার জেদ বাড়িয়া উঠিল ; সে শোভনাকে তাড়া করিয়া নীচের প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত লইয়া চলিল, তাহার মনে হইতে লাগিল—শোভনা আর এক মুহূর্ত্ত থাকিলে তাহার স্বামীকে বুঝি আর বাঁচান যাইবে না!

শোভনা গেল, সত্যই আজ সে বাটীর বাহির হইয়া গেল, রাত্রির অন্ধকারে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। পরক্ষণেই আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিল। নয়নতারার চীৎকার শুনিয়া গৃহিণীর আমলের বুড়া দাসী ছুটিয়া আসিয়া, শোভনাকে উপরে সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদিমণি কি হয়েছে গা?" শোভনা রুদ্ধ কণ্ঠে—"ও কিছু না" বলিয়া ত্বরিতপদে উপরে উঠিয়া গেল, তারপর নিজের ঘরে গিয়া হাতের চুড়ি গলার হার খুলিয়া রাখিয়া দিয়া, বাক্স হইতে বহুমূল্য ফ্রেমে বাঁধা রমাদেবীর একখানি ফটো ও নিজের দিনলিপি খানি বাহির করিয়া সযত্নে আপন বক্ষাবরণের মধ্যে রাখিয়া দ্রুত বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। তার পর অন্ধকারের মাঝে মিশিয়া গেল। কেহ দেখিলও না জানিলও না। শোভনা যে চিরদিনের মত গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছে সে সন্দেহও কাহার মনে উদয় হইল না।

যথাসময়ে থালে রাত্রির খাবার সাজাইয়া গ্লাসে জল দিয়া আসন পাতিয়া বামুনঠাকরুণ নয়নতারা ও শোভনাকে ডাকিতে পাঠাইল। নয়নতারা আসিল, কিন্তু—শোভনা? শোভনা কোথায়? নয়নতারা ডাকিল—"শোভনা"— "শোভনা!" কিন্তু কোথায় শোভনা? বাড়ীর প্রত্যেক

স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল কিন্তু শোভনাকে পাওয়া গেল না ! বিরক্ত হইয়া নয়নতারা একাই আহারে বসিল, কিন্তু তাহাতে রুচি হইল না, দুই এক গ্রাস মুখে তুলিয়াই সে উঠিয়া পড়িল। নয়নতারা ভাবিতে লাগিল—তবে সত্যই শোভনা চলে গেল নাকি ? কিন্তু যাবে কোথা ? এজগতে তা'র আর যাবার স্থান কোথা ? যাক্ এখনি আবার ফিরে আস্‌তে হবে।

শয্যার উপর স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া, স্বতন্ত্র শয্যায় কোলের ছেলেটাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নয়নতারা ঘুমাইতে গেল। কিন্তু ঘুম তাহার চক্ষে আসিল না, মন শান্ত হইল না। অশান্ত মনে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া পাশের জানালাটি খুলিয়া শোভনার অন্ধকার ঘরটার দিকে চাহিয়া রহিল। কোথাও একটু সামান্য শব্দ হইলেই তাহার মনে হইতে লাগিল—ওই বুঝি শোভনা ফিরে এল ! তারপর শেষরাত্রে শ্রাবণের মেঘ যখন সগর্জ্জন ধারাবর্ষণ আরম্ভ করিল—নয়নতারা আর স্থির থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বাহিরে গিয়া ভৃত্যকে জাগাইয়া বলিল—"রামসহায়, শীঘ্র বাগান থেকে নিধিয়াকে ডেকে নিয়ে দুজনে শোভনাকে খুঁজে বাড়ী ফিরিয়ে আন—এমন দুর্য্যোগে বাইরে থাক্‌লে সে যে মারা যাবে !"

রামসহায় "রাম হো" বলিয়া হাই তুলিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"এ বৃষ্টিতে কি করে বেরব দিদিমণি? কোথায় বা যাব? বৃষ্টিটা ধরুক্‌ আগে, নইলে আলো নিবে যাবে যে, এ অন্ধকারে পথ দেখতে পাব কেন?"

*　*　*　*

কথাটা যখন মন্মথনাথের কানে পৌঁছিল, সকল কথা না জানিলেও, নয়নতারাই যে শোভনার গৃহত্যাগের কারণ, তাহা আর তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। জননী-সমা শ্বশ্রূর মৃত্যুকালের অনুরোধ তাঁহার স্মরণ হইল। তাঁহার শেষ কথা—"বাবা মন্মথ! তোমায় আর বেশী কি ব'লব? শোভনাকে তোমার সহোদরা ভগ্নীর মত দেখো আর মনে রেখো, শোভনা যদি কষ্ট পায়, জীবনের পরপারে গিয়েও আমার আত্মা অসুখী হবে"—আজ যেন নূতন করিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন। শয্যার উপর মন্মথ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নয়নতারার দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"তাহলে ত চল্‌বে না; যে রকমেই হোক শোভনাকে খুঁজে বাড়ীতে আন্‌তে হবে। যাও—যাও—শীঘ্র চারিদিকে লোক পাঠাও—দেরি কোরনা।"

বহুদিন ধরিয়া বহু অনুসন্ধান করিয়াও শোভনাকে

পাওয়া গেল না। তখন হতাশ হইয়া ব্যথিত চিত্তে মন্মথনাথ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। নয়নতারা মনে মনে তুদিন অনুতাপ করিল, দাসদাসীরা তু-একবার বলিল —"আহা শোভনা মেয়েটী বড় ভাল ছিল গো!" তারপর ক্রমে সকলেই শোভনার কথা এক রকম ভুলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

একে একে পাঁচটী বৎসর চলিয়া গেল। নয়নতারার দিন যেমন সুখে কাটিতেছিল, তেমনই কাটিতে লাগিল।

সে বৎসর কলিকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। সপ্তাহে সপ্তাহে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; হাঁসপাতাল বসন্তরোগীতে পূর্ণ হইল, ঘরে ঘরে বসন্ত-রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তার কবিরাজের আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেই সময় নয়নতারা তাহার পুত্র কন্যাদের লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। একে একে সকল ছেলে মেয়েরই বসন্ত হইল—একজন সারিয়া উঠে ত আর একজন পড়ে। আর সকলে সহজেই আরাম হইয়া উঠিল, কিন্তু ছোট খোকা নালুকে লইয়া নয়ন-তারাকে ভারি বিপদগ্রস্ত হইতে হইল। মন্মথ বুঝিলেন নালুর এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার!

নয়নতারাও এদিকে মাসাধিককাল এক একটী ছেলে মেয়ের সেবা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রাত জাগিয়া জাগিয়া তাহার চোখের কোলে কালি পড়িয়াছিল, মানসিক উদ্বেগে তাহার দেহ শীর্ণ ও মন দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছিল—সে হতাশভাবে তাহার ক্লান্ত দেহ নালুর পাশে ঢালিয়া দিল।

ডাক্তার তাহাদের মাতা পুত্রের শুশ্রূষার জন্য মন্মথকে দুজন নার্স্ নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হাঁসপাতালের সুনিপুণা ধাত্রী মিসেস্ মুখার্জ্জি, আর কাহারও আবশ্যক নাই বুঝিয়া একাই উভয়ের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন।

পায়ে জুতা মোজা, পরিধানে শাদা সেমিজ্ জ্যাকেটের উপর শাদা থান, চুলগুলা পুরুষের মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, চোখে সোণায় বাঁধান চস্‌মা—মিসেস্ মুখার্জ্জি যখন ডাক্তার রায়ের সহিত আসিয়া, স্বভাবিক নম্রতার সহিত মন্মথকে নমস্কার করিয়া খোকার শয্যা পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন—সে দীপ্তনয়ন উন্নত স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিতে হঠাৎ যেন মন্মথের সাহস হইল না। তাঁহার পরিচ্ছদের শুভ্রতায় বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কেমন একটী পবিত্রতার আভাস ছিল, যাহাতে সহজেই মন্মথের মনে তাঁহার প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠিল। প্রথম দর্শনেই মিসেস্ মুখার্জীকে একজন অসাধারণ রমণী বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।

মিসেস্ মুখার্জী সেই দিন হইতেই খোকা ও খোকার

মাতার শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন, মন্মথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। নয়নতারার রোগও সাধারণ হয় নাই; সুতরাং এই মাতা-পুত্রকে নিরন্তর যেন যমে-মানুষে টানাটানি করিতে লাগিল। মিসেস্ মুখার্জী অক্লান্ত পরিশ্রমে দিবা-রাত্র তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। পরের ছেলের প্রতি ধাত্রীর এই অসাধারণ যত্ন দেখিয়া মন্মথ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ডাক্তার রায়ের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া একদিন বলিলেন—"রমণী স্বভাবতঃই স্নেহশীলা জানি, কিন্তু এত স্নেহ যে কেহ করিতে পারেন তাহা আমি জানিতাম না।"

ডাক্তার রায় বলিলেন—"বাস্তবিক মিসেস্ মুখার্জীর মত স্নহশীলা সেবাকুশলা ধাত্রী আমি আর দেখিনি।"

খোকা ক্রমে নীরোগ হইয়া উঠিল, কিন্তু নয়নতারার পীড়া সঙ্কটাপন্ন হইল। মিসেস্ মুখার্জী আহার নিদ্রা ভুলিয়া প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন। মন্মথ ও নয়নতারা তাঁহার যত্নে যেন কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

ডাক্তার রায় একদিন ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌চি এত পরিশ্রম আপনার সহ্য হ'বে না, অন্য কোন ধাত্রীকে এ কাজে নিযুক্ত করে আপনি কিছুদিনের জন্য অবসর নিন। আশ্চর্য্য!

আপনি মুহূর্ত্তের জন্য ক্লান্তি বোধ করেন না!” ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন—“ক্লান্তি কিসের ডাক্তার রায়? এই ত আমাদের কাজ, এ কাজে নিজের শরীর দেখ্‌তে গেলে চলে না।”

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ডাক্তারের সুচিকিৎসা ও ধাত্রীর সেবাগুণে অবশেষে নয়নতারা রোগমুক্ত হইল। নয়নতারাকে সম্পূর্ণ সুস্থ, এমন কি, সংসারের কার্য্যক্ষম দেখিয়া একদিন মিসেস্ মুখার্জী তাহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিদায় মুহূর্ত্তে ধাত্রীর রক্তহীন পাংশুমুখ শীর্ণ দেহ ও নিষ্প্রভ নয়ন দেখিয়া নয়নতারা নিজের রোগই ইহার কারণ ভাবিয়া ব্যথিত হইল। ধাত্রীর ঋণ অপরিশোধনীয় বুঝিয়াও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মন্মথ তাঁহাকে যাহা দিতে আসিলেন, সুমিষ্ট বাক্যে সবিনয়ে তাহা তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিয়া ধাত্রী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দুঃখিত মন্মথনাথের কথার উত্তরে পরদিন ডাক্তার রায় হাসিয়া বলিলেন—“মিসেস্ মুখার্জীর উহাও আর একটি বিশেষত্ব, উনি যে রোগী হাতে নেন্, প্রাণ দিয়ে তার সেবা করেন, কিন্তু কখন একটি পয়সা নেন্ না, বরং অনেক সময় অসমর্থ দরিদ্র রোগীদের নিজের পয়সায় পথ্য পর্য্যন্ত জুগিয়ে প্রাণপণে সেবা করে, তাকে রোগমুক্ত

করে রিক্তহস্তে বাড়ী ফেরেন। সর্ব্বস্ব দান করে এক এক সময় অতি কষ্টে নিজের আহার চালাতে দেখেছি, কিন্তু হাঁস্পাতালের মাসিক বেতন ভিন্ন কাহার আছে কিছু নিতে এ পর্য্যন্ত দেখিনি।"

মিসেস্ মুখার্জ্জী নয়নতারার শুশ্রূষায় নিজের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া হাঁস্পাতালে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; আসিয়াই তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। হাঁস্পাতালের ডাক্তার মিস্ স্মিথ্ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, সংবাদ পাইবা মাত্র আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার শুশ্রূষার বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, নিজে তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ মুখার্জ্জীর পীড়ার সংবাদ যখন নয়নতারার কাণে গেল, কালবিলম্ব না করিয়া সে হাঁস্পাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল। মিসেস্ মুখার্জ্জী তখন জ্বরে অচৈতন্য, নয়নতারাকে চিনিতেই পারিলেন না। কিন্তু নয়নতারা আজ তাঁহার সজ্ঞা-বিহীন মুখে কি জানি কিসের আভাস পাইয়া কয়েকবার অনিমেষ নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া মিস্ স্মিথ্ কে মিসেস্ মুখার্জ্জীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বাড়ীতেও নয়নতারা মিসেস্ মুখার্জ্জীকে কয়েকবার তাঁহার

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বল্পভাষিণী ধাত্রী এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই।

নয়নতারার অনুরোধে মিস্ স্মিথ্ বলিলেন—"কয়েক বৎসর হইল, হাঁস্পাতালের কিছু দূরে রাস্তার কাদার উপর ওঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পাই, সেই হ'তে উনি এখানেই আছেন। বেশ সুশিক্ষিতা দেখে আমি চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়া এই কাজে নিযুক্ত করি; ওঁর নাম কি তা জানি না, মিসেস্ মুখার্জী বলেই আমরা ওঁকে জানি। অনেক চেষ্টাতেও কোন পরিচয় জান্তে পারিনি; নিজের কথা উনি কোন দিন কাকেও বলেন না। ওঁর কাছে একখানা ফটো আছে, আজ সকালে হঠাৎ ওঁর বাক্সের চাবি আমাকে দিয়ে বলেছেন, ওঁর যদি মৃত্যু হয়, শ্মশানে যখন দেহ পুড়ে ছাই হ'বে, তার পর সেই ফটোখানির সঙ্গে ওঁর নিজের ফটো একত্রে বাঁধিয়ে যেন যত্ন ক'রে হাঁস্পাতালে রেখে দেওয়া হয়। বউ! আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এই চাবি নিয়ে সে ফটোখানা দেখ্তে পারেন।"

নয়নতারার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হইয়াছিল। মেমের নিকট হইতে চাবি লইয়াই সে মিসেস্ মুখার্জ্জির বাক্স খুলিয়া ফেলিল। ফটোখানি দেখিল তাহার স্বর্গগতা জননীর!

বিকারের ঘোরে একজন ধাত্রীর হাত হইতে অডি-কলোনের শিশি সজোরে ফেলিয়া দিয়া মিসেস্ মুখাৰ্জ্জী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বেরো বেরো অলক্ষণা বাড়ী থেকে বিদেয় হ।"

হাত হইতে ফটোখানা ফেলিয়া উন্মত্তার মত ছুটিয়া আসিয়া, নয়নতারা দুই হাতে মিসেস্ মুখার্জ্জিকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর পড়িয়া, সস্নেহে চুম্বন করিতে করিতে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"শোভনা! সুলক্ষণা! দিদি আমার! ক্ষমা কর। আর ও-কথা বল্‌ব না, চির অভাগিনি! আর তোমায় দুঃখ দেব না।"

শোভনা একবার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। সেই হাসিই যে তাহার শেষ হাসি —নয়নতারা তাহা বুঝিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল, শোভনা হাসিতে হাসিতে পৃথিবীর নিকট শেষ বিদায় লইল!

হ্যালির ধূমকেতু

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সেদিন রাত্রে বেণীপ্রসাদের সঙ্গে রামদুলারীর বেশ একটা রীতিমত কলহ হইয়া গেল। এতটা যে হইবে তাহা কাহারই জানা ছিল না, প্রথমে একটা সামান্য বিষয় লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে করিতে ক্রমে কলহটা গুরুতর রকমের হইয়া পড়িল। রাগের মাথায় রামদুলারী বলিয়া বসিল—"কল্যাণী মায়ি করুন তোমার মুখ যেন আর আমায় দেখ্‌তে না হয়, আজকের ঝগড়াই যেন আমাদের শেষ ঝগড়া হয়।" বেণীপ্রসাদও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তরে বলিল—"আহা তাই হোক্, কল্যাণী মায়ি তোমার মন্‌সা পুরা করুন। আর আমিও যদি যথার্থ পুরুষ হই তোমার মুখ আর দেখ্‌ব না। তোমার ভারি তেজ, কিন্তু জেনে রেখ! মনে করলে তোমার তেজ আমি একদিনে ভাঙতে পারি। তোমার মত দশটা বড় মানুষের

মেয়ে বিয়ে করে এনে তোমাকে তাঁদের দাসী করে রাখতে পারি।”

স্বামীর কথায় রামদুলারীর ক্রোধ দ্বিগুণ হইল,—অ্যাঁ, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার বাপের খেয়ে মানুষ উনি, দশটা বিয়ে করে এনে আমাকে তাঁ’দের দাসী করে রাখতে পারেন?” এমন কথা রামদুলারীর মুখের উপর বলিতে বেণীপ্রসাদের সাহস হইল! সে ভাবিল স্বামীর মুখে এমন কথা শোন্‌বার চেয়ে আমার মরণ হ’ল না কেন? রাগে অভিমানে রামদুলারী ফুলিতে লাগিল, তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না. কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া শয্যায় গিয়া ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

বেণীপ্রসাদ গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইয়া গেল। রামদুলারীর অভিমান চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল; তাহার নয়নে বান ডাকিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, জীবনে আর বেণীপ্রসাদের সঙ্গে কথা কহিবে না। পূর্ব্বাপর সকল কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া যতই তাহার অভিমান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রতিজ্ঞাটা দৃঢ় করিবার জন্য ততই সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল কথা কহিব না,—না, কখনই না,—কোনমতেই না,—কিছুতেই না,—পায়ে ধরিয়া সাধিলেও না!

কাঁদিতে কাঁদিতে রামদুলারী ক্লান্ত হইয়া পড়িল, রাগও কতক পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু তখনও বেণী-প্রসাদ ফিরিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি হইতে ওড়না সরাইয়া, আদর করিয়া তাহার রোদন স্ফীত আঁখি দুটি নিজের রুমালে মুছাইতে আসিল না! একে একে ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল তবুও বেণীপ্রসাদ তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, অন্যদিনের মত সাদরে বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া মুখের উপর হইতে চূর্ণকুন্তলগুলি সরাইতে সরাইতে কোমল কণ্ঠে "আউর মত রোও পিয়ারী—" বলে তাহার মলিন মুখে হাসি ফুটাইবার সহস্র চেষ্টা করিল না! রামদুলারী বিস্মিতা হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই বেণীপ্রসাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় কে জানে কোন্ সময় ক্লান্ত দেহ মন লইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

গৃহের বাহির হইয়া বেণীপ্রসাদ একেবারে বাহির বাটীর ছাদে আসিয়া চতুর্দ্দিকব্যাপী অন্ধকারের মাঝে ভারাক্রান্ত হৃদয় ও চিন্তাকুল মস্তিষ্ক লইয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল! তারপর কি ভাবিয়া ছাদ হইতে নামিয়া নিজের পাঠগৃহের দ্বার খুলিয়া বাতি জ্বালিয়া টেবিলের উপর হইতে খানকতক সংবাদ পত্র লইয়া

আগ্রহের সহিত তাহার বিজ্ঞাপন গুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইয়া আসিল, সংবাদ পত্র যথাস্থানে রাখিয়া বাতি নিবাইয়া আবার ছাদে গিয়া অশান্ত-চিত্তে সেই অন্ধকারের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। আজ তাহার প্রাণে এক নূতন সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল, পত্নীর প্রতি বিরক্তি বশতঃ গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না।

বেণীপ্রসাদ সদ্বংশের কিন্তু নিতান্তই দরিদ্রের সন্তান। তাহার শশুর স্বর্গীয় লালা শঙ্করনারায়ণ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র ত্রিবেণীনারায়ণকে যেমন অত্যাধিক আদরে লালন পালন করিয়া ছিলেন, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষাও দিয়াছিলেন। বেণীপ্রসাদকেও তিনি শৈশবাবধি আপন গৃহে রাখিয়া পুত্রাধিক স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন। পিতামাতা অবর্ত্তমানে পুত্র ত্রিবেণীনারায়ণও আপন কনিষ্ঠার ন্যায় পরম যত্নে বেণীপ্রসাদকে রাখিয়াছেন ও সুশিক্ষা দিতেছেন। ত্রিবেণীনারায়ণ এখানকার একজন বড় দরের উকিল; ইচ্ছা, বেণীপ্রসাদও আইন পরীক্ষা দিয়া তাঁহারই ব্যবসা অবলম্বন করে; ভাই নাই, ভাইয়ের স্থান অধিকার করিয়া চিরদিন তাঁহার সহিত একগৃহেই অবস্থান করে। বেণী-

প্রসাদেরও ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু পিতৃ ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিতা রামদুলারীর আচরণ, সময়ে সময়ে তাহাকে বড়ই মর্ম্মাহত করে। বেণীপ্রসাদ রামদুলারী অপেক্ষা তিন বৎসরের মাত্র বড় ছিল, সেইজন্য স্বামী বলিয়া রামদুলারী তাহাকে বড় একটা সম্মান দেখাইত না। তাহা ভিন্ন শৈশব হইতে একস্থানে পালিত হওয়ায় তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসার যেমন বাহুল্য ছিল বিবাদ বিসংবাদেরও তেমনি অপ্রতুল ছিল না। অধিকাংশ স্থলে তাহাদের কলহের মূলে রামদুলারীরই দোষ থাকিত কিন্তু সকলেই তাহার সকল কার্য্য চিরদিন বড় স্নেহের চক্ষে দেখিত, এমন কি বেণীপ্রসাদ নিজে তাহার নিকট লাঞ্ছিত হইয়াও কোনদিন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া থাকিতে পারিত না। অনেক সময় তাহার সুন্দর মুখের রূঢ় কথা গুলা অসহনীয় হইলেও বেণীপ্রসাদ শশুরালয়ের সুখ সৌভাগ্যের সহিত পিতৃভবনের দুঃখময় অবস্থা ও বিমাতার দুর্ব্ব্যহারের তুলনা করিয়া সহ্য করিয়া যাইত। বেণীপ্রসাদের সঙ্গে রামদুলারীর কলহ ক্রমে নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, খুটি নাটি লইয়া তাহাদের ঝগড়াও যেমন শীঘ্র হইত আবার ভাব হইতেও দেরী লাগিত না। রাগের সময় যাহা মুখে আসিত রামদু

তাহাই শুনাইয়া দিত, আবার একটু পরেই হয়তো রাগ শান্ত হইলে, স্বামীকে সাধ্যসাধনা করিয়া কথা কহাইত। বেণীপ্রসাদও তাহার সুরমা-রঞ্জিত মনোমোহন চোখ দুটি, টিকুলি ও নথ্‌নি-শোভিত গোলগাল হাসি হাসি মুখখানি দেখিলে তাহার শত অপরাধ ভুলিয়া যাইত; কিন্তু আজিকার কলহের পূর্ব্বাপর সকল কথা তাহাকে নিতান্তই ব্যথিত করিয়াছিল, তাহার নিদ্রিত আত্ম-সম্মান বোধ জাগাইয়া দিয়া ছিল, তাই অন্যদিনের মত আজ আর সহ্য করিতে পারিল না।

প্রভাতে বেণীপ্রসাদ রাত্রির ঘটনা মনোমধ্যে গোপন রাখিয়া ত্রিবেণীনারায়ণের নিকট সংবাদপত্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখাইয়া ও আপনার সঙ্কল্প জানাইয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ত্রিবেণীনারায়ণ বিজ্ঞাপনটা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন—চাকরীটা মন্দ নয় বটে, উন্নতিরও বিশেষ আশা আছে, তবে দূর অনেকটা, চাকরীর অনুরোধে সম্প্রতি অত দূরদেশে যাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখিনা, আরও দুটো বছর কলেজে থেকে ওকালতি পাশ করে আমার কাছে থেকেই এখানকার কোর্টে ওকালতি করতে পারে, তাতে উপার্জ্জন এর চেয়ে বেশী বই কম হবে না ও সেই ভাল বুঝিয়া ত্রিবেণীনারায়ণ

বলিলেন—"সেই ভাল বেণী! যেমন কলেজে পড়্‌চ তেমনি পড়। মিছামিছি এত দূরে চাকরী করতে যাবার আবশ্যক নাই! আমার কাছে থেকে ওকালতিতে পরে তুমি ঢের বেশী উপার্জ্জন করতে পারবে। এরই মধ্যে এত তাড়া কিসের? সংসারের ভার তো আমার উপর, সে জন্য তো তোমায় কিছু ভাবতে হচ্চে না?"

বেণীপ্রসাদ সকলি বুঝিল, কিন্তু পত্নীর ব্যবহার তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, রামদুলার গতরাত্রির প্রত্যেক বাক্য আজ এখনও পর্য্যন্ত তাহার অন্তরকে বিদ্ধ করিতেছিল। গর্ব্বিতা পত্নীকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার বাসনা তাহার মনে প্রবল হইয়াছিল! ত্রিবেণীনারায়ণের অসম্মতি আজি তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। ক্রমে বহু তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে তাঁহার সম্মতি লইয়া কর্ম্মের জন্য আবেদনপত্র পাঠাইয়া বেণীপ্রসাদ কর্ম্মস্থলে যাইবার আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

সপ্তাহ মধ্যে বেণীপ্রসাদ বিদেশে চাকরী করিতে যাইবে ইহা সকলেই জানিতে পারিল, একথা রামদুলারীরও কর্ণে গেল, কিন্তু সে কাহাকেও কিছু বলিল না, এবারকার কলহের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না, কেবল আপন মনেই রাগে ও অভিমানে ফুলিতে লাগিল। বেণী-

প্রসাদ ব্যস্ততার ভাণ করিয়া বাহিরে বাহিরে ফিরিতে লাগিল, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

প্রবাসযাত্রার পূর্ব্বে বাটীর সকলের নিকট বিদায় লইয়া বেণীপ্রসাদ একবার শয়ন কক্ষে আসিল, রামদুলারী পুত্রকে কোলে লইয়া দুগ্ধপান করাইতেছিল। কয়দিনের পর স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অভিমানিনীর অভিমান উথলিয়া উঠিল, নয়ন কোনে অশ্রু দেখা দিল। কিন্তু, পাছে তাহার চোখের জল ধরা পড়ে—বেণীপ্রসাদের অনাদরে রামদুলারী মরমে মরিয়া আছে, পাছে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কোলের ছেলে দোলায় শোয়াইয়া, অন্য দ্বার দিয়া দ্রুতগতিতে গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

স্বামীর প্রতি তাচ্ছল্য দেখাইবার জন্য রামদুলারী চঞ্চল পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু বেণীপ্রসাদের নিকট তাহার মনোভাব গোপন রহিল না। তাহার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি, অসংস্কৃত বেশভূষা, অবিন্যস্ত কেশপাশ তাহার অন্তরস্থ ক্ষোভের সাক্ষ্য দিয়া গেল। নিমিষের জন্য বেণীপ্রসাদের প্রাণে ব্যথা লাগিল, সকল মান অপমান বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া তাহাকে সাদরে ফিরাইয়া আনিবার অভিলাষ হইল। বিদায় মুহূর্ত্তে পত্নীর অন্ততঃ

হাসিমুখ দেখিয়া যাইবার আশা প্রবলতর হইয়া উঠিল, কিন্তু মনে পড়িল "হাঁথী কা দাঁত আউর মরদ কা বাত ;" বেণীপ্রসাদকে আত্মসম্বরণ করিতে হইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। ফিরিয়া দোলনা হইতে পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আদর করিল, হাসাইয়া, নাচাইয়া তাহার কচিমুখে শত চুম্বন দিয়া, স্নেহভরে তাহাকে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় দোলনায় শয়ন করাইয়া বৃথা রামতুলারীর দর্শনাশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বহির্ব্বাটীতে আসিল।

বেণীপ্রসাদ চলিয়া গেলে রামতুলারী গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবার ওড়নায় মুখ ঢাকিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেণীপ্রসাদের প্রবাস গমনের পরদিনই আকাশে হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিল। ছোট বড় অনেকেই বলিল "এবার লক্ষণ বড় ভাল নয়।" চাকরাণী মহলে কথা উঠিল আকাশে যখন "বঢ়ানি" * উঠিয়াছে তখন এ বৎসর লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হইবে; ওই বঢ়ানি যখন দেশের আনাজ (ধান, গম, জনারি, বজারি, মুগ, কড়াই প্রভৃতি) ঝাড়ু দিয়া লইয়া যাইবে তখন কি আর দেশে কিছু থাকিবে? সকলে না খাইয়া মারা যাইবে। অনেকেই একথা শুনিল। শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে ধূমকেতু পৃথিবী হইতে যায় তাহার জন্য অনেকেই দেবীর পূজা মানিল। সকলেরই মনে অল্প বিস্তর ত্রাসের সঞ্চার হইল। বাড়ীর চাকর দাসীদের মুখে রামদুলারীও শুনিল কিন্তু তাহার মনে বিশেষ কোন ভাবের উদয় হইল না, কথাটি বেশীক্ষণ মনেও রহিল না। আজকাল তাহার মনে বেণী প্রসাদের চিন্তাই প্রবল হইয়াছে। তাহার অদর্শনের কষ্টই

* পশ্চিমে সাধারণ অশিক্ষিত লোক ধূমকেতুকে "বঢ়ানি" অর্থাৎ ঝাঁটা বলিয়া থাকে।

তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছে, অন্য কিছু ভাবিবার তাহার অবসর নাই। পাঁচ বৎসর বয়সে বেণী প্রসাদের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে আর এখন তাহার বয়স বাইস বৎসর, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনও তাহাকে বেণীপ্রসাদের বিচ্ছেদ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, একটি দিনও তাহাকে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় নাই। শিশুকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বেণীপ্রসাদ তাহার শত অপরাধ ভুলিয়া সকল বিরোধ ঘুচাইয়া, নিত্য নিয়মিত সময়ে হাসিমুখে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কতদিন কত খুঁটি নাটি লইয়া তাহাদের কত ঝগড়া হইয়াছে, কখন বেণীপ্রসাদ তাহাকে, কখন সে বেণী-প্রসাদকে সাধিয়া কথা কহাইয়াছে। মান অভিমান হাসি কান্না তাহাদের নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল কিন্তু কেহ কাহারও প্রতি রাগ করিয়া এক বেলা কাটাইতে পারিত না, একদিন কেহ কাহারও অদর্শন সহিতে পারিত না। কিন্তু এবার এ কি হইল! একটু নির্জ্জন পাইলেই রামদুলারী বসিয়া ভাবিত এমন কেন হইল? "দোহাই মা কল্যাণী আমার অপরাধ নিওনা, দয়া করে তাঁকে ফিরিয়ে এনে দাও। এমন কাজ আর করব না। তেমন কথা আর বলব না।"

স্বামী চলিয়া গেলে, রাগ অভিমানে বিদায় দিয়া স্থির মনে রামদুলারী সমস্ত ভাবিয়া দেখিয়াছিল যে, বলিতে গেলে দোষটি তাহার নিজেরই সম্পূর্ণ। চির ক্ষমাশীল, চির প্রেমময় স্বামী তাহার অনুচিত ব্যবহার এ পর্যন্ত অনেক সহিয়া আসিয়াছেন। অনুতাপে রামদুলারীর হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। নির্জ্জনে চোখের জল মুছিয়া দিনের পর দিন গণিতে লাগিল। ভ্রাতার নিকট স্বামীর নিরাপদে পৌঁছান সংবাদ আসিল, আরও কয়েক খানা পত্র আসিল কিন্তু তাহার নামে কোন পত্র আসিল না। রামদুলারী লেখা পড়া জানেনা, নিজেও কোন পত্র দিতে পারিল না। ভউজি (ভায়ের স্ত্রী) বেশ লেখাপড়া জানেন, পিত্রালয়ে থাকিতে মিশন স্কুলে পড়িয়াছেন, এখানেও ত্রিবেণীনারায়ণের নিকট বিশেষ ভাবে শিক্ষা পাইয়াছেন। তিনি অনায়াসেই পত্রাদি লিখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা জানাইবার সাহস তাহার নাই। জগতের মধ্যে সে ভউজিকে যত ভয় করে এত আর কাহাকেও নয়, তাই তাঁহার কাছে অনেক কথাই তাহাকে গোপন রাখিতে হয়। আবার ভউজি ভিন্ন তাহার এমন আপনার লোকই বা কে আছে যাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলে বা কোন সুখ

দুঃখের কথা জানাইতে পারে ? তাই মনের দুঃখ মনে রাখিয়া রামদুলারী দিন কাটাইতে লাগিল।

মে মাসের দিন। কখন্ ভোর হইয়াছে ! কিন্তু বেলা যেন আর ফুরাইতে চাহিতেছে না, রৌদ্রও কমে না দিনও শেষ হয় না। ঘরের বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, হু হু শব্দে 'লু' * চলিতেছে, ঘরের মাঝে পাখার তলে বসিয়াও গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে।

বাবু ত্রিবেণীনারায়ণের বাড়ীর চাকর বাকর অনেকেই এখনও দিবানিদ্রা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে নাই। পত্নী মোহনী ছেলে মেয়ে কয়টীকে লইয়া ঘরের মধ্যেই শয়ন করিয়া আছেন। মহারাজিন্ † নীচের ঘরে বুড়িয়ার সহিত গল্প করিতে করিতে পুদিনার চাটনি প্রস্তুত করিতেছে। আর রামদুলারী নিজের শয়ন গৃহে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে জাগরিত পুত্রকে পুনরায় ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। শিশুপুত্র সুখলালকে কোলে লইয়া শিরে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে সুর করিয়া রামদুলারী বলিতেছে—

* পশ্চিমে গ্রীষ্মকালের আগুনে হাওয়া।

† পাচিকা ব্রাহ্মণী।

"আ-জা-রী নিদিয়া তু আ-জা-রী আ !
মেরে বালে কি আঁখোঁমে ঘুল্ মিল্ যা।
হাট বাটমে গলি গলি মে, নীদ করে চক্ ফেরে ;
সাম কো আওয়ে পুত সুলাওয়ে উঠ্ যায় বড়ে সবেরে।
আ জা নিদিয়া আ জা ! তেরী বালা জোহে বাট্,
সোনে কা হ্যায় পায়ে জিস্‌কা রূপে কী হ্যায় খাট,
মখ্‌মল্ কা হ্যায় লাল বিছৌনা, তাকিয়া ঝালরদার,
সওয়া লাখ হ্যায় মোতি জিস্‌মে, লটকেঁ লাল হাজার।
চার বহু আওয়ে বালে কে, দো গোরী দো কালী,
দো ঝুলাওয়েঁ দো খিলাওয়েঁ লে সোনে কী থালী।"

এমন সময়ে আপাদমস্তক রৌপ্যালঙ্কার-ভূষিতা ফুললতা-চিত্রিত-রঙ্গিন-সাড়ী-পরিহিতা পঞ্চাশোর্দ্ধ বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা পৈরাগিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রামদুলারীর গৃহে উপস্থিত হইল।

রামদুলারী ঘুম পাড়ানিয়া গীত বন্ধ করিয়া সহর্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"আরে ! মেরী বুয়া ! * এত্‌না রোজ কেঁও † নহি আয়ো বুয়া ?"

* পিতার ভগিনী।

† কেন।

কপালের ঘাম মুছিয়া পৈরাগিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

বুড়োকে ক্লান্ত দেখিয়া রামদুলারী একটু অপেক্ষা করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। নানা কথার মাঝে সে অনুরোধ করিল—"দু এক ভজন শুনায় দেও বুয়া।"

বুয়ার মুখে ভজন শুনিতে রামদুলারীর ভারি ভাল লাগে। কত লোক ভজন গাহে, কিন্তু পৈরাগিয়ার মত এমন সুন্দর করিয়া খুব অল্প লোকই ভজন গাহিতে পারে, সে জন্য শুধু রামদুলারী নহে, অনেকেই তাহার গানের ভক্ত। যে একবার শুনিয়াছে সে বারবার শুনিতে চায়। ভজন গাহিতেও পৈরাগিয়ার আলস্য নাই। ভোর পাঁচটা হইতে নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত—খাইতে, শুইতে কর্ম্ম করিতে, পথ চলিতে, আপন মনে পৈরাগিয়া ভজন গাহিয়া নিজের মনের প্রসন্নতা রক্ষা করে। পৃথিবীতে তাহার আপন বলিতে কেহ নাই; সকলি বিসর্জ্জন দিয়া একটি মাত্র পুত্র লইয়া পৈরাগিয়া সংসারে দাঁড়াইয়াছিল; কয়েক বৎসর হইল তাহাকেও বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে! পুত্রবধূ পিত্রালয়ে গিয়া আবার বিবাহ করিয়াছে, তাহার সহিতও পৈরাগিয়ার সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে। সকলে ভাবিয়াছিল এইবার বুঝি পৈরাগিয়া পাগল হইয়া যাইবে, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহাকে পাগল হইতে হয় নাই, পাড়ার লোকের কাহারও

বুয়া, কাহার মউসি, কাহারও. চাচী অথবা দাদী হইয়া, তাহাদের বাড়ী যাওয়া আসা করিয়া, কথাবার্ত্তা কহিয়া, ভজন গাহিয়া কোন রকমে দিন কাটাইয়া দেয়।

রামদুলারী ভজন শুনিতে চাহিলে অন্যদিনের মত গান আরম্ভ না করিয়া পৈরাগিয়া সবিষাদে কহিল—"ভজন কেয়া শুনোগী বেটী, হাঁস্‌নে বোল্‌নে কো দিন বিতা, আব জান্ সাম্‌হাল্‌নে কি দিন আ গিয়া।"

রামদুলারী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেঁও বুয়া? য়্যায়সা কেঁও বোলতী হো? হুয়া কেয়া?"

পৈরাগিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"কেয়া বতাঁউ বেটি তুমহে? তুম তো শুনতেহী কাঁপ উঠোগী?"

রামদুলারী কোলের ছেলে ভূমে নামাইয়া পৈরাগিয়ার হাত দুটি ধরিয়া, সানুনয়ে ব্যাপার কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে বলিল। কোন অজানিত বিপদাশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল।

পৈরাগিয়া তখন ধূমকেতুর উল্লেখ করিয়া বলিল—"সত্‌রা তারিখ কো তো সূরজ নারায়ণসে আউর বঢ়ানি-সে বড়ি লড়াই হোই; উস্‌কে পিছে আঠারা তারিখকো ভুঁইডোল * আওয়েগা, জিস্‌মে নীচে পিথী উপর হোগা,

* ভূমিকম্প।

উপ্পর পির্থী * নীচে হোগা। মানাই হাঁস্‌তে রহ্‌ যায়েগা, শোতে শোতে রহে যায়েগা, বৈঠে বৈঠে রহে যায়েগা'; কেহুকা বোল চাল কো ফুরসৎ না মিলেগা, যো যাঁহা রহেগা তাঁহাই জান নিকাল যায়েগা!"

রামদুলারী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"ইয়ে তো বড়ি ডর কি বাত হ্যায় বুয়া? কেয়া, সচ্‌ য়্যায়সা হোগা?"

পৈরাগিয়া বলিল—"আরে! দেখো তামাসা! সচ্‌ নহে তো কেয়া ঝুঠ্‌ বাতাওয়েকে রহা! বেটী ইয়ে তুমহারী হামারী বাত থোড়াই হ্যায়, ইয়ে তো সব পত্রি † মে লিক্‌খে গয়ে হুঁায়। মেরি ক্যা? যাঁহা রহুঙ্গী হুঁয়াই জান নিকল যায়েগা, কোই ডর কে বাত নহি হ্যায়। ড'র তো বেটী তুহী লোগ কা হ্যায়!"

বুয়ার উপর তো রামদুলারীর দৃঢ় বিশ্বাস আছেই, তাহা ভিন্ন পত্রিতে যখন লিখিয়াছে, খোদ পণ্ডিতজীর মুখে বুয়া স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছে তখন তো আর ইহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না! রামদুলারী তখন বিষণ্ণ ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আপন মনে

---

* পৃথিবী।

† পঞ্জিকা।

বলিল—উপ্পর পৃথ্বী নীচে আওয়েগা নীচে পৃথ্বী উপ্পর যায়েগা! উৎকন্ঠিত চিত্তে ব্যাকুল কণ্ঠে রামাদুলারী জিজ্ঞাসা করিল—"মেরি সুখলাল? বুয়া! মেরি সুখলালভী না জীয়েগা? মেরি ভাইয়া—আউর" রামদুলারী স্পষ্ট করিয়া বেণীপ্রসাদের কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পৈরাগিয়া বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,—"আরে বওরাহী! * ইয়ে নেহি সমঝ্তিহো, পৃথ্বী যব উলট্ পালট্ যায়েগা, তব, কাঁহা রহেগা সুখলাল, আউর কাঁহা তেরী ভাইয়া?"

রামদুলারী শিহরিয়া উঠিয়া ক্রোড়স্থিত সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ঝর্ ঝর্ করিয়া চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

পৈরাগিয়া ব্যথিত হইয়া আপন অঞ্চলে তাহার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"না রোও বাচ্চা না রোও। রোয়কে কেয়া করোগী; ইয়ে তো সব নারায়ণকে খেল, ইসমে মানাইকে কিছু হাথ নহি হ্যায়। চুপচাপ রহে যাও, যউন্ বদা হ্যায় তউন্ হোবেই করি, যউন্ হাল

---

* পাগ্‌লী।

সবকা হোই সো হাল তুমহুকা হোই। নাহক রোয়কে কেয়া করোগী ?”

বহুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর পৈরাগিয়া রামদুলারার নিকট হইতে উঠিয়া গেল।

পৈরাগিয়া গৃহে ফিরিলে রামদুলারী ভৌজির নিকট এই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল।

মোহনী বুঝিলেন তাঁহার ক্ষীণ বুদ্ধি ননদটীকে এই আজগুবি সংবাদ শুনাইয়া আবার কে পাগল করিয়া দিয়া গিয়াছে। রঙ্গ দেখিবার জন্য প্রকাশ্যে বলিলেন—“সত্যি নাকি ? তবে তো মহা বিপদ দেখচি রামদুলারী ! তা হলে কি হবে ?”

রামদুলারী উত্তর করিতে পারিল না, হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মোহনী হাস্য গোপন করিয়া কৃত্রিম বিষণ্নতার সহিত বলিলেন—“আমার তো যাহোক এক প্রকার ভাল, সকলে একস্থানে আছি, কোন ভাবনা নাই; মরি মরব এক সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমারই তো ভাবনা, সুখলালের বাপ বিদেশে, আহা মরতেই যদি হয়, মরণ কালে একবার স্বামীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। কি আপশোষ ”।

রামদুলারী নিজের চিন্তায় বিভোর, মোহনীর বিদ্রূপ কিছুই বুঝিলনা, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"নসীব! নহিলে এমনই বা হবে কেন? আরও তো কতবার "ভূঁই-ডোল" হয়েচে, কিন্তু এমন তো কখন হয় নি, এ সূরজ নারায়ণের সঙ্গে বঢ়ানির বিবাদ কিনা, এতে কি আর স্বস্তি থাকতে পারে?"

মোহনী উচ্ছ্বসিত হাস্য-বেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "তাইত, এযে বিষম ব্যাপার!"

ভৌজীর নিকট কোন সান্ত্বনা না পাইয়া রামদুলারী আবার নিজের ঘরে গেল। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিল, ১৯ তারিখের প্রলয়ের পূর্ব্বে বেণীপ্রসাদকে কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে আসিতে টেলিগ্রাম করাই তাহার স্বামীর সহিত শেষ সাক্ষাতের একমাত্র উপায়। কিন্তু টেলিগ্রাম করে কাহার দ্বারা? অশ্রুজলে ভাসিয়া রামদুলারী ভাবিল রাগের মাথায় যাহা বলিয়াছি তাহাই কি সত্য হইবে? এ জীবনে আর কি সে হাসিমুখ দেখিতে পাইব না? চিন্তাক্লিষ্ট অন্তরে রামদুলারী দেবমন্দিরে গিয়া করযোড়ে পতির মঙ্গল কামনা করিল। রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সকাতরে কহিল

হে মা কল্যাণী! হে মায়ি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর! মহাপ্রলয়ের আগে একবার তাঁহার নিকট আমার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবার সময় দাও!

সে দিন সমস্ত রাত্রি রামদুলারীর চিন্তা ও অশ্রুবর্ষণে অতিবাহিত হইল। গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য গৃহের বাহিরে ছাদের উপর সুখলালকে লইয়া রামদুলারী শয়ন করিয়াছিল। রাত্রি তিনটার সময় পূর্ব্বদিকের আকাশে উজ্জ্বল ধূমকেতু দেখা দিল; অন্যদিনের ন্যায় কৌতূহলী দৃষ্টিতে আর সে তাহা দেখিতে পারিল না, সজল নয়নে কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিতে চাহিতে তাহার মনে হইল, সেই ঝাঁটাকৃতি রক্তবর্ণ ধূমকেতু যেন তাহার রক্তজিহ্বা প্রসারণ করিয়া পৃথিবী গ্রাস করিতে আসিতেছে; যেন উজ্জ্বল নয়নে বিশেষ ভাবে তাহারই দিকে চাহিয়া বলিতেছে —"দে রামদুলারী তোর সুখলালকে আমায় দে, একে একে তোর আপনার লোক গুলিকে আমায় সমর্পণ কর, শেষে তুই নিজেও আমার মুখে এই উজ্জ্বল আগুনের মাঝে ঝাঁপ দে।" ধূমকেতুর সে আহ্বান যেন সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল, শিহরিয়া রামদুলারী দুইহাতে চোখ ঢাকিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও নিস্তার নাই, মানস-নেত্রে সে সূরজনারায়ণের সহিত বঢ়ানির ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে

লাগিল। ছাদে শয়ন করিয়া থাকা তাহার অসাধ্য হইল, সুখলালকে বুকে করিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে সে গৃহের কোণে আসিয়া নিদ্রাহীন চক্ষে বসিয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে রামদুলারী ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামলালকে বাইসিকেল কিনিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া গোপনে বেণীপ্রসাদকে টেলিগ্রাম করিতে সম্মত করাইল। টেলিগ্রামে লেখা হইল, "পিসীমার সহিত শেষ দেখা করিবার ইচ্ছা থাকে তো অবিলম্বে এলাহাবাদে আসুন," টেলিগ্রামে নিজের নাম সহি করিয়া শ্যামলাল পুরস্কারের লোভে নিজে তারঘরে গিয়া তার করিয়া আসিল।

রামদুলারী উৎকণ্ঠিত চিত্তে যুগপৎ স্বামীর আগমন ও অনিবার্য্য মহাপ্রলয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

টেলিগ্রাম পাইয়াই বেণীপ্রসাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। রামদুলারীর সঙ্গে শেষ দেখা—সেকি! এই ক'য়দিনের মধ্যে তাহার এমন কি ব্যায়রাম হইল? সবিষাদে বেণীপ্রসাদ ভাবিল তাহার অনাদরে অভিমানিনী রামদুলারী না জানি কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছে। নিজের অবিবেচনায় বেণীপ্রসাদের মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল।

নূতন চাকরী, সহজে ছুটী মিলিল না, কর্ম্মে জবাব

দিয়া বেণীপ্রসাদ গৃহে ফিরিল। দেউড়িতে পা দিতে তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, বুঝি বা কি অমঙ্গলের কথা তাহাকে শুনিতে হয়! কাহারও রোদনধ্বনি বুঝি বা তাহার কাণে যায়! উদ্বেগ-ব্যাকুল-চিত্তে বেণীপ্রসাদ অন্তঃপুর অভিমুখে অগ্রসর হইল, কিন্তু কোন দিকে কোন্ অশুভ চিহ্ন তাহাকে অধিকতর ব্যথিত করিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিতেই ত্রিবেণীনারায়ণ ও মোহনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা হঠাৎ বেণীপ্রসাদকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন! বেণীপ্রসাদ ত্রিবেণী-নারায়ণকে টেলিগ্রাম দেখাইয়া রামতুলারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহার সুস্থ সংবাদ দিয়া শ্যামলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

শ্যামলাল আসিলে তাহার নিকট হইতে অনেক সংবাদ প্রকাশ পাইল। আগাগোড়া সকল কথা পরিষ্কার হইলে মোহনী ত হাসিয়া আকুল। চিন্তার আধিক্যে রাম-তুলারী যে তারিখ ভুলিয়া গিয়াছে, মোহনী ইহাও বুঝিলেন। ঘটনাটা তাহার খুবই আমোদজনক বোধ হইল। ত্রিবেণীনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন "তা বেশ ভালই হয়েছে, বেণীর চাকরী করার সাধটাও খুব অল্পদিনেই মিটে গেল।"

হ্যালির ধূমকেতু

বেণীপ্রসাদ যখন রামদুলারীর ঘরে আসিল, কয়দিনের দারুণ উদ্বেগের সহিত যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে রামদুলারী মূর্চ্ছিতা হইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। যখন জ্ঞান হইল কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে বলিল "এই শেষ, আর তোমায় দেখ্‌তে পাব না! কাল ১৮ তারিখ এই রাতটুকু শেষ হইলেই বঢ়ানির সঙ্গে সূরজনারায়ণের লড়াই বাধ্‌বে, পৃথিবী উল্‌টে যাবে, বঢ়ানির আগুনে দুনিয়া জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!"

বেণীপ্রসাদ সাদরে পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া হাসিয়া বলিল—"কাল ১৮ তারিখ তোমায় কে বল্লে? এখন যে ১৯ তারিখের রাত্রি! ভয়ের দিন তো কেটে গেছে। ওই দেখ, আকাশে ধূমকেতু যেমন তেমনি আছে, কেবল তোমার রকম দেখে বাড়ীশুদ্ধ লোক হেসে আকুল হচ্চে!"

* * * * *

প্রভাতে বেণীপ্রসাদ মোহনীকে বলিল—"বহুজী লোকে বলে ধূমকেতু অমঙ্গলের চিহ্ন, আমি তো দেখ্‌চি ধূমকেতুর উদয়ে আমার সুমঙ্গলেরই সূচনা হ'ল।" *

---

* সত্য ঘটনামূলক।

মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সখি বয়ে যায় বেলা, শুধু হাসি-খেলা!
একি আর ভাল লাগে?
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন,
নিত নব অনুরাগে!

সপ্তাহব্যাপী বর্ষার পর একটি বিমল রবি-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ ছাত্র অনিলকুমার যখন দুটি নীলোৎপল আঁখির ধ্যানে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটি ঘটাইয়া কলেজের রসায়নাধ্যাপকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে জমিদার-ভবনের একটী নিভৃত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া অবসাদগ্রস্ত হৃদয়ে সমদুঃখভাগিনী সমবয়স্কা ভ্রাতৃজায়ার চিত্তে সহানুভূতি জাগাইয়া সুহাসিনী গাহিতেছিল—"শুধু হাসি খেলা একি আর ভাল লাগে, সখি! একি আর ভাল লাগে—।"

তরুণীর মর্ম্মবেদনা যেন গানের সুরে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। তাহার সজল আঁখির ব্যথা-ভরা দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনীর কমলমুখ বিষাদ-ম্লান করিয়া ধীরে ধীরে বায়ু তরঙ্গে মিশিতেছিল!

ক্রমে গান থামিল; গৃহ নীরব হইল। কণ্ঠস্বর যখন নীরব হইল, হৃদয়ের অভিব্যক্তি তখন নয়নে-নয়নে চলিল! বারিভরা নয়নের সে নীরব দৃষ্টি কত কথা কত ভাব ব্যক্ত করিল! হৃদয়ের কত চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইল! সরলা আবেশবিহ্বলা তরুণীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণপণ চেষ্টায় নিরপরাধার এ মনোবেদনা দূর করিব। স্বামীর সহিত সুহাসিনীর মিলন ঘটাইব!

রায় বিশ্বম্ভর চৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনীর তখন পূর্ণযৌবন, অনুপম সৌন্দর্য্যে দেহটী ঘেরা, অনাবিল হৃদয়-খানি গভীর প্রেমে পূর্ণ। আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে উজ্জ্বল উচ্ছল!

পিতৃ-ভবনে তাহার আদর-যত্ন বিলাস-বিভবের অন্ত নাই। আত্মীয় বন্ধুর স্নেহ-প্রীতির অভাব নাই। তথাপি কেন যে হাস্য-কৌতুকের অন্তরালে তাহার অন্তর দুঃখের ভারে দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহা ভ্রাতৃজায়া

সরলা ভিন্ন আর কেহই বুঝিত না। সকলেই ভাবে তাহার দিন বড় সুখে কাটে। বাহির হইতে সকলে হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিই দেখে, কিন্তু অন্তরটি তাহার হাস্যোজ্জ্বল কি অশ্রুম্লান, হর্ষোৎফুল্ল কি বিষাদ-মথিত সে-খবর কেহ রাখে না।

পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু অনিলকুমার বা সুহাসিনী কেহ আর দ্বিতীয় বার শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিতে পায় নাই। দুই তিনবার কুটুম্ব-গৃহে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়া দৈবযোগে সুহাসিনীর স্বামীসন্দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল মাত্র। তাহার পিতার সহিত শ্বশুরের বিবাদ! মনান্তরের মূলে উভয় পক্ষেরই আভিজাত্যের অভিমান। সুতরাং কুটুম্বদ্বয়ের মানের বোঝাপড়ার মাঝে পড়িয়া পরস্পরের সান্নিধ্যপ্রয়াসী নিরীহ নবদম্পতি জীবনের সুখ-শান্তি হারাইতে বসিয়াছিল।

শ্বশ্রূর সহায়তায় বহুচেষ্টার ফলে সরলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। অনিল সুহাসিনীর সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইল। কিন্তু হায়, কে জানিত এই ক্ষণিকের সাক্ষাৎই তাহাদের মহা অনর্থের কারণ হইবে! মিলনের মধুক্ষণের মধুরতা অনুভব করিতে না করিতেই বিদায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত অভিশপ্ত মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িবে!

যথেষ্ট সাবধানতা সত্বেও অনিল ধরা পড়িল। আনন্দ-বিহ্বল মুগ্ধ দম্পতি শিহরিয়া মর্ম্মাহতচিত্তে পরস্পরের নিকট বিদায় লইল। ক্রোধে কোপন-স্বভাব বিশ্বম্ভর চৌধুরীর মূর্ত্তি ভীষণ হইল। সুহাসিনী মনে-মনে প্রমাদ গণিল। অনিলের গমনপথে নিবদ্ধ দৃষ্টি সুহাসিনী নীরবে বিশ্বজননীর চরণে পতির মঙ্গল কামনা করিল। অবিবেচক অভিভাবকের অন্যায় শাসনে শাসিত দম্পতির পরিণাম চিন্তা করিয়া সরলা স্তম্ভিত হইল! আর এমন সঙ্কটের দিনেও কন্যা-জামাতার প্রতি স্নেহ প্রকাশে অসমর্থ উপায়ান্তরবিহীনা জমিদার-গৃহিণীর বক্ষ যেন দুঃখের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল!

* * * * *

কোন রকমে কথাটা অতিরঞ্জিতভাবে অনিলের পিতার কর্ণে উঠিল! জমিদার ভূপাল রায় বুঝিলেন, তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া অনিল অপমানিত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। অহঙ্কৃত জমিদার-দ্বয়ের এই সূত্রে বিবাদটা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। উভয়েই পিতৃশাসন উল্লঙ্ঘনকারী পিতৃগর্ব্ব-খর্ব্বকারী কুলাঙ্গার পুত্র-কন্যাকে উচিতমত ভৎ‍র্সনা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরশাসন-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলেন!

বহুদিনের হতাশার পর অনিলের দ্বিতীয় পত্র অসম্ভা-বিতরূপে সুহাসিনীর হস্তগত হইল। সে চিঠিতে আর কিছুই নাই, কেবল পত্রখানির ছত্রে ছত্রে গভীর অতুলনীয় প্রেমের বিকাশ আর আকুল আহ্বান!

সুহাস একবার দুইবার বারবার সে পত্রখানি পাঠ করিল। বারবার সরলা তাহা শ্রবণ করিল। দুটি অভিন্নহৃদয় বন্ধু স্থির করিতে পারিল না এখন তাহাদের কর্ত্তব্য কি?

ক্ষণেক চিন্তার পর সরলা বলিল, "তুই একটু বোস ভাই, আমি একবার মা'র ঘরে যাই।"

সরলা চলিয়া গেলে সুহাসিনী লক্ষ্যহীন অবসাদগ্রস্ত মনটাকে স্থির রাখিবার জন্য তাহার প্রিয়চিন্তা হইতে জোর করিয়া সরাইয়া লইয়া একখানা পুস্তকের পৃষ্ঠার মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল।

সুহাসিনা বুঝিয়াছিল লোকে যাহাকে "সুখ" বলে, জগতের সেই দুর্লভ লোভনীয় পদার্থটির নিকট হইতে চিরদিনই তাহাকে দূরে থাকিতে হইবে। পিতৃপ্রদত্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ আর তালুকের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব করিতে করিতে, লোক দেখান মৌখিক হাস্যামোদের ভিতর দিয়া গুণটানা নৌকার মত তাহার

জীবনটাকে কোনোরকমে মরণের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ইহাই তাহার নিয়তি, তাহার ভাগ্যফল।

সুহাসিনী মনে করিল—"আচ্ছা ভাগ্যফল না কর্ম্ম-ফল? এজন্মে ত কর্ম্মের অবসরই পাইলাম না। পূর্ব্ব-জন্মে কি কর্ম্ম করিয়াছিলাম যাহার এই ফল পাইলাম? আমি কি আমার পুত্রবধূকে এমনই ভাবে বঞ্চিত করিয়াছিলাম? কিন্তু তাহা হইলে যাহারা এজন্মে ঠিক এই কর্ম্ম করিতেছে তাহারা পরজন্মে কি ফল পাইবে?" সুহাসিনী একটু হাসিল।

পুত্রবধূ সরলার মুখে সুহাসিনীর জননী, জামাতার পত্রের কথা শুনিয়া অনেক চিন্তার পর সুহাসকে তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠানই স্থির করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"অনিল!" পিতার জলদগম্ভীর স্বরে চমকিত হইয়া অনিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে পিতার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পিতা ভাবিলেন, "ছোঁড়াটা একেবারে উচ্ছন্ন গেছে, পড়তে বসেছে তাও সেই ছোটলোকের মেয়ের ফটোখানা সাম্‌নে রেখে! ধিক্ পিতৃগর্ব্বখর্ব্বকারী কুলাধম পুত্র! থাম, শীঘ্রই এর উপযুক্ত প্রতিবিধান করচি।" তিনি সম্মুখের চেয়ারখানিতে বসিয়া একখানি পত্র পুত্রের হস্তে দিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন,—"দেখ দেখি চিঠিখানা কার হাতের লেখা! পাত্রীর পিতাকে আমার কোন্ শত্রু এ চিঠি লিখলে?"

অনিল পত্রখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ধীরস্বরে উত্তর করিল, "আমি,—এ চিঠি আমিই লিখেছিলুম।"

"কেন? কার বুদ্ধিতে কোন্ সাহসে আমায় লুকিয়ে এমন চিঠি তুমি লিখলে?

"আমি আর বিবাহ কোরবো না।"

"করবে না?"

"না"। রুদ্রমূর্ত্তি পিতার সমক্ষে অনিলের স্পষ্ট উত্তর—"না।"

দুর্ব্বল নিরীহ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, শত্রুর যম প্রবল-প্রতাপ ভূপালচন্দ্র রায়ের মুখের উপর এমন স্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করা! কি দুঃসাহস! ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"না? বিয়ে করবে না? ওঃ স্পর্দ্ধা তো কম নয়! আমার হুকুম—ও ছোটলোকের মেয়ের মায়া ত্যাগ করে তোমায় বিবাহ করতেই হবে।"

অনিল পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিল—"না তা হবে না, আর যা' বলেন পারবো, কিন্তু আপনার এ অন্যায় আদেশ আমি পালন করতে পারবো না!"

পুত্রের উত্তর দিবার ভঙ্গী দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া বলিলেন—"জান, আমার আদেশ অমান্য করে আমায় অসন্তুষ্ট করলে তোমায় আমি ইচ্ছা করি তো আমার বিপুল সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে পারি?"

অনিল নিরুত্তর রহিল।

ক্রোধোন্মত্ত জমিদার আবার বলিলেন, "শোন অনিল! যদি আমার অবাধ্য হও তোমায় আমি ত্যাজ্যপুত্র কোরবো, আমার অতুল সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে তোমায় সম্বলহীন পথের ভিখারী কোরবো।"

তথাপি অনিল নিরুত্তর!

বহুক্ষণ বহু তর্জ্জন গর্জ্জনের পরও পুত্রকে নিরুত্তরে নতশিরে থাকিতে দেখিয়া অবশেষে অনুমান করিলেন, পুত্র ভীত হইয়াছে। সত্যই তো সাধ করিয়া কে এমন পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে চাহে? সুতরাং মৌনই সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া তিনি পুত্রকে তাঁহার আদেশ বুঝাইয়া দিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে সুহাসিনীর পাল্কী জমিদার ভূপাল রায়ের ভবনের অন্তঃপুরের একটি গুপ্তদ্বারে নামিল। পাল্কী-বেহারা ও সঙ্গের লোকজন সকলেই নীরবে ফিরিয়া গেল।

কম্পিতহৃদয়ে ধীর পদক্ষেপে সুহাসিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল দিবালোকে আনন্দের কোলাহলে চৌদিক ধ্বনিত করিয়া যেখানে তাহার রাণীর মত গৌরবে দাঁড়াইবার কথা, সেই সুখের স্বামী-গৃহে সে কি না আজ সন্ধ্যার আঁধারে নিঃশব্দে চোরের মত গুপ্ত-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল! কোন্ পথে প্রবেশের সুবিধা হইবে তাহাও অনিল পত্রে লিখিয়াছিল; এখানে যে অনিলের অপেক্ষা করিবার কথা; সে পথ দেখাইয়া না লইয়া গেলে সুহাসিনী কোথা যাইবে? এ ভবনের সর্ব্বস্থান তো তাহার সুপরিচিত নহে?

উৎকণ্ঠিতভাবে অবগুণ্ঠন সরাইয়া সুহাসিনী একবার চতুর্দ্দিকে চাহিল—একি! সহসা সন্ধ্যার গম্ভীর শঙ্খধ্বনি ও ধূপ ধূনার সৌরভের সহিত মিশ্রকুসুমের সুবাস ও নহবতের এমন মধুর ধ্বনি কোথা হইতে আসিল? প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনী যেন শুনিতে লাগিল দুঃসাহস! দুঃসাহস!

প্রাঙ্গণে পা দিতেই যে সংবাদ সুহাসিনীর কর্ণে পৌঁছিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সুহাসিনী দেখিল অগণিত দাস দাসী আত্মীয়-কুটুম্বে গৃহ পূর্ণ, সারা-ভবনখানি আনন্দের হাস্যরোলে মুখরিত। শুনিতে পাইল প্রভাতে তাহার স্বামী অনিলকুমারের বিবাহ! মর্ম্মাহত-চিত্তে সুহাসিনী ভাবিল এমনই যদি মনে ছিল, তবে কেন অমন চিঠি তাহার স্বামী তাহাকে লিখিলেন? সুহাসিনীর জন্য যদি চরণে স্থান নাই, তবে কেন বৃথা আশা দিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে আনিলেন? সেই চিঠি, যাহা লইয়া সে আজ পিতার অজ্ঞাতসারে জননীর অনুমতি ও আশী-র্ব্বাদ মাত্র পাইয়া দীনবেশে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসি-য়াছে, এখনও যে তাহা তাহার নিকটে রহিয়াছে। সে বুঝিল এখানে আর তাহার কোনো অধিকার নাই, সামান্য একজন দাসীর যে জোর—যে সম্মানটুকু আছে, এ সংসারে

তাহার তাহাও নাই। এ গৃহে দীনহীনা ভিখারিণীরও স্থান আছে, কিন্তু তাহার নাই। এখানেও আশ্রয় নাই, পিতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া আসিয়াছে, সেখানেও আর ফিরিবার উপায় নাই! সে মনে মনে বলিল "হায়, কোন্ সাহসে, কি আশায় এ দুঃসাহসের কাজ করিলাম!"

সুহাসিনী চক্ষে আঁধার দেখিল, মস্তিষ্কের মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল। আর এক পদও অগ্রসর হইবার তাহার সামর্থ্য রহিল না। আশঙ্কা অনুতাপ ও উদ্বেগে যখন তাহার রক্ত হিম, দৃষ্টি ব্যাকুল, চরণ গতিশক্তিহীন— কাহার মৃদুস্পর্শে চমকিত হইয়া মুখ তুলিতেই দেখিল অনিল! রুদ্ধ নিশ্বাসে পাংশু মুখে সুহাসিনী সম্মুখে হেলিয়া পড়িল, তাহার পদদ্বয় আর তাহার ভার বহন করিতে পারিল না! প্রসারিতহস্তে অনিল অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতাকে রক্ষা করিল।

বধূর কপাল ভাঙ্গিয়া বৈবাহিকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার উৎকট আগ্রহে সুহাসিনীর শ্বশুরমহাশয় বহু অনুসন্ধানে এক উপাধিধারী রাজার একমাত্র কন্যার সহিত অনিলের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন।

রাজকন্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক নয়, ভবিষ্যতে অনিল উত্তারাধিকারসূত্রে শ্বশুরের সমুদয় সম্পত্তিই

লাভ করিতে পারিবে এবং বিবাহকালে যৌতুক-স্বরূপ যাহা পাইবে তাহাতে স্বয়ং জমিদার মহাশয়েরও ঐশ্চর্য্য-বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা হইবে; অধিকন্তু বধূ আপন অতুলনীয় রূপের দ্বারা অনিলের হৃদয় হইতে সুহাসিনীর ছবি—এমন কি তাহার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে মুছিয়া দিতে পারিবে। এই অভাবনীয় আনন্দে জমিদার-দম্পতির হৃদয় পূর্ণ! বিবাহের মাসাধিকব্যাপী উৎসব আয়োজনের মাঝে তাঁহাদের উৎসুক-চিত্ত কেবল সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে—যখন রাজপুত্রী কনকলতা বধূরূপে আসিয়া তাঁহাদের গৃহ উজ্জ্বল ও সুহাসিনীর জীবন চিরবিষাদে আচ্ছন্ন করিবে!

পিতার ইচ্ছায় বাধা দিবার পক্ষে অনিল, জননীর নিকট কিছু সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিল; কিন্তু বুঝিল, সে আশাও দুরাশা মাত্র। বিবাহে নিতান্তই অনিচ্ছা বুঝিয়া জননী যখন আগ্রহভরে তাঁহার ভাবী পুত্রবধূর প্রতিকৃতিখানি তাহার হস্তে দিয়া তাহাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন, এমন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা তাহার উচিত নয় এবং তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিতে সে তাহা পরিবেও না, তাঁহাদের আদেশ ও অভিলাষ অনুসারে তাহাকে পত্নীত্যাগ করিয়া দারান্তর গ্রহণ করিতেই

হইবে, সে তখন আর অনর্থক বাদানুবাদ অনুনয় বিনয় না করিয়া চিন্তাকুলচিত্তে নিজ কক্ষে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কনকের ফটোখানি লইয়া গেল।

ছবিখানি আর ফিরিয়া না পাইয়া মা হাসিয়া ভাবিলেন, "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।" মত ফিরিতে দেরী লাগিবে না।

নির্জ্জন শয়ন-কক্ষে সুহাসিনীর সযত্ন-রক্ষিত ফটোখানির পার্শ্বে কনকলতার প্রতিকৃতিখানি রাখিয়া পলকহীন নেত্রে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া অনিল ভাবিল, হাঁ সুন্দরী বটে! কুমারীর দেহখানি যেন বসন্তের কুসুম সুষমা লইয়া গঠিত। কিন্তু এ অতুলনীয় রূপরাশি কি জীবনব্যাপী অশান্তির তাপে শুকাইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে! না কখনই না। যে আধারে তোমার শোভা শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে, সৌন্দর্য্যের জীবন্তপ্রতিমা কনকলতা তোমায় আমি সেই আধারে রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনীর যখন বোধশক্তি আবার ফিরিয়া আসিল, সে দেখিল আলোকোজ্জ্বল পুষ্প-গন্ধময় সুসজ্জিত কক্ষে সে তাহার প্রিয়তমের হর্ষোজ্জ্বল দৃষ্টির নিম্নে কুসুম-শয়নে পুষ্প-উপাধানে শায়িত!

কি আনন্দ! সুহাসিনী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া একবার হাসিল। মনে হইল স্বপ্ন! স্বপ্ন? তা হোক্ দুঃখিনীর ভাগ্যে সত্যকার দুঃখের চেয়ে সুখের স্বপ্নও ভাল। তাহাও প্রার্থনীয়, লোভনীয়!

তাহার মনে পড়িল ছয়বৎসর পূর্ব্বের সেই ফুলশয্যার দিন। সে আপন মনে বলিয়া উঠিল—"ঠিক সেই দিনের মতই না?"

সুধামাখা কণ্ঠে প্রসন্নমুখে অনিল উত্তর করিল, "হাঁ, সুহাস! ঠিক সেই দিনের মত সবই, কেবল সে দিন ঘরে অনেক লোক ছিল, অনেকের মাঝে তুমি আমায়, আমি তোমায় চিনেছিলাম, আর আজ সব বাধা-বিঘ্ন-ভয় ভাবনাকে দূরে সরিয়ে তুমি আমায় আমি তোমায় পেয়েছি। অতীতের দুঃখ ভূলে দেখ সুহাস আজ কেবল

আনন্দ উল্লাস, সুখ-শান্তি! কি সুন্দর জীবন আমাদের—কি সুখের মিলন!

* * * * *

প্রভাতে কুসুম-ভূষণা ঊষারাণীর সঙ্গে সঙ্গে এয়োগণ সধবার উজ্জ্বল বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া প্রসন্নমনে মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য সম্মিলিত হইয়া প্রতিক্ষণে অনিলের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বধূ সুহাসিনীর আগমন অনিলের কৌশলক্রমে কাহারো গোচর হইতে পায় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কাহারো মনে কোনই প্রশ্ন উঠিল না। কিন্তু বহুক্ষণ অতীত হইল গাত্রহরিদ্রার লগ্ন উত্তীর্ণ হইতে চলিল তথাপি অনিল বাহিরে আসিয়া শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিল না দেখিয়া পুরস্ত্রীগণ উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। আজিকার দিনে অনিলের এই অশিষ্ট আচরণে রুষ্ট জমিদার মহাশয়ের তর্জ্জন গর্জ্জনে সারাভবন কম্পিত ও নর-নারীগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল; ভৃত্যদের প্রতি অনিলের শয়নকক্ষের দ্বার ভগ্ন করিবার আদেশ দিয়া তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন।

দ্বার ভগ্ন করিতে হইল না, অর্গলহীন রুদ্ধদ্বার সামান্য আঘাতেই খুলিয়া গেল। প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণালোকে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত সকলে দেখিলেন গৃহ শূন্য!

অনিল নাই, কেবল সহস্র সুগন্ধি পুষ্পের সুবাসামোদিত কক্ষমধ্যে পালঙ্কের উপর সযত্নে রচিত একটি পুষ্পশয্যা মধুনিশি অবসানে হর্ষ-বিহ্বল দম্পতির মিলন-স্মৃতি জাগাইয়া অলসভাবে পড়িয়া আছে।

পরদিন বৈকালে যে সময় বরের শোভাযাত্রা বাহির হইবার স্থির ছিল—অনুসন্ধানে প্রেরিত লোকজন ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—গতরাত্রে অনিলের সবিশেষ চেষ্টায় তাহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কুমুদরঞ্জন রায়ের সহিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে শুভক্ষণে রাজপুত্রী কনকলতার শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বন্ধুর বিবাহে অনিল সস্ত্রীক উপস্থিত ছিল, ইহার পর তাহাদের আর কোন সংবাদ কেহ জানে না।

বীণার বিবাহ।

(১)

পতিশোক-সন্তপ্তা সদ্যঃ বিধবা প্রভাকে যখন পাষাণে বুক বাঁধিয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া চাহিতে হইল, তখন তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে তাঁহার একমাত্র স্নেহের ধন কুসুমকোমলা বালিকা বীণার প্রতিই পতিত হইল! আজ সেই সংসার-জ্ঞান-বিহীনা আজন্ম সুখ-পালিতা সরলা বীণাপাণির দশা কি হইবে? তাহার পিতার অবর্ত্তমানে তাহাকে কে আশ্রয় দিবে, কে যত্ন করিবে?

চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা বেষ্টিত নানা বৃক্ষ সমাচ্ছাদিত বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পুষ্পলতা পরিশোভিত এই ক্ষুদ্র গৃহখানি সুখী দম্পতী সুধাংশুনাথ ও প্রভার সুবিমল চরিত্র-মাধুর্য্যে ও প্রফুল্লমুখী বীণাপাণির মধুর হাস্যে একদিন প্রকৃত শান্তি-নিকেতন ছিল। যে প্রভা একদিন দেবপ্রতিম স্বামীর পবিত্র হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব

করিয়াছিলেন, প্রিয়তম পতির সদা প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া প্রাণাধিক কন্যাকে বুকে লইয়া পৃথিবীতে স্বর্গের আভা দেখিয়াছিলেন, হায়! আজি তাঁহার নয়ন সম্মুখ হইতে নিয়তি সে আলোক অপসারিত করিল, তাঁহার সে সুখ-স্বর্গ মিলাইয়া গেল!

সুধাংশুনাথ সচ্চরিত্র ও বহু সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলেও তাঁহার প্রধান দোষ এই ছিল যে, তিনি অমিতব্যয়ী ও অপরিণামদর্শী যুবক ছিলেন! অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন সুধাংশুনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট চির-বিদায় লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বহু নিষেধ সত্তেও গবর্ণমেণ্টের চাকরি গ্রহণ করিয়া আত্মীয়-স্বজন-বিহীন সুদূর পার্ব্বত্য-প্রদেশে আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার প্রিয় বন্ধু সুরেশচন্দ্রের আন্তরিক যত্নে ও সাধ্বী পত্নী প্রভাবতীর সেবাগুণে জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রবাস বাসের কষ্ট কখন অনুভব করিতে হয় নাই। পত্নী-প্রেম-মুগ্ধ কন্যা-স্নেহ মোহিত সুধাংশুনাথের জীবনের দিনগুলি বড় সুখে কাটিতেছিল। প্রসন্নচিত্ত সুধাংশুর মুখে কখনও বিষাদের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় নাই; ভবিষ্যতের কোন চিন্তা কখনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সুসজ্জিত কক্ষে শুভ্র সুন্দর পরিচ্ছদ-শোভিতা হইয়া কুসুম-সুবাসে গৃহ আমোদিত করিয়া প্রফুল্লমুখী বীণাপাণি যখন বীণা সংযোগে মধুর কণ্ঠে গাহিত—"তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন"—তখন পুলকিতচিত্তে সুধাংশুনাথ বলিয়া উঠিতেন "দেখ, দেখ প্রভা! বীণা আমার কত সুন্দর"! তাঁহার মনে হইত সত্যই বুঝি সুরলোক-বাসিনী বীণাপাণি দয়া করিয়া কন্যারূপে তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিতে আসিয়াছেন। ভ্রান্ত সুধাংশুনাথ একদিনও ভাবেন নাই যে, এ রত্ন চিরদিন গৃহে রাখিতে পারিবেন না, একদিন স্ব-ইচ্ছায় অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়া পিতার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

(২)

বীণার জ্যেষ্ঠতাত হিমাংশুনাথ বীণার পিতৃ বন্ধু সুরেশ-চন্দ্রের প্রেরিত টেলিগ্রামে ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া ব্যথিত চিত্তে ভ্রাতৃবধু ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন।

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস ক্ষান্ত হইলে ক্রন্দনের বেগ সম্বরণ করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বীণার জ্যেঠাইমা কয়েক মুহূর্ত্ত বীণার দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন—

"ওমা এ মেয়ে কত বড় হয়ে উঠেছে! লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে গো!" বীণার দূরসম্পর্কীয়া এক বিধবা পিসি প্রভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বলি হ্যাঁ ছোট বউ, এত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখে ভাত মুখে রুচ্‌ছিল কি করে? খুব নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পেরেছিলে যাহোক ত!" প্রভা অশ্রুপূর্ণ নেত্র নত করিয়া নিরুত্তরে সকলের কথাই শুনিলেন। তাঁহার বলিবার মতও কিছু ছিল না, কেননা আজন্ম সুখপালিতা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বীণাকে দেখিলে পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী বলিয়া ভ্রম হইত।

কয়েক দিবস মধ্যেই এই কন্যা সম্বন্ধে কত কথাই না তাঁহাকে শুনিতে হইল, তাঁহার পরলোক গত স্বামীর ও তাঁহার এই অবিবেচনার জন্য কত ভর্ৎসনাই তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল।

* * * * * *

দেখিতে দেখিতে নানা সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল। আদরিণী বীণা ও প্রভা শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া চোখের জল চোখে রাখিয়া বুকের ব্যথা বুকে ধরিয়া নিরবে দিনের পর দিন গণিয়া যাইতে লাগিলেন।

ধন-সম্পত্তিহীনা দুঃখিনী বিধবা কন্যার বিবাহের এখনও

কোন উপায় করিতে পারেন নাই। বীণার জেঠামহাশয় ক্রমেই বীণাকে গৃহের আবর্জ্জনা স্বরূপ মনে করিতে লাগিলেন। ভাল বা মন্দ যে কোন পাত্রের হস্তে বীণাকে ন্যস্ত করিতে পারিলেই যেন তিনি একটি বৃহৎ দায় হইতে মুক্ত হন। বীণার মায়ের যত হউক আর নাই হউক বীণার জ্যেঠাইমার লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিয়াছে "দেশে কি বর নেই গা, না ওর জেঠামহাশয় টাকা খরচ কর্‌তে নারাজ ? কিন্তু মেয়ে এমনি অপয়া যে ওর বর আর মিল্‌চে না !"

(৩)

দেখিয়া শুনিয়া প্রভা দিন দিন হতাশ হইতে লাগিলেন। বীণার বিবাহের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে হিমাংশু বাবু শেষে এক ছাপ্পান্ন বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত বীণার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন। জ্যেঠাইমা বলিলেন—"যাহোক এতদিনে ত বীণার আইবুড়ো নামটি ঘুচ্‌বে ?" প্রভা বড় যায়ের চরণ অশ্রুসিক্ত করিয়া এ সম্বন্ধ ভঙ্গ করিবার জন্য কাতরে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে গর্ব্বিতা যায়ের কঠোর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া প্রভা তাঁহাকে দৃঢ়স্বরে বলিলেন বীণার হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া খাবেন তবুও বুড়ার

সঙ্গে বিবাহ দিবেন না। প্রভার যা একেই প্রভা ও বীণাকে ভার স্বরূপ মনে করিতেছিলেন, তাহার উপর আবার প্রভার প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, "ঘোর কলি কিনা, ভাল করতে চাইলে মন্দ হয়! তা বাপু তোমার শক্তি থাকে বীণাকে ভাল বরে দাও বা, আমাদের যা সাধ্যি আমরা তা করেছি। কিন্তু এও বলে রাখছি ছোট বৌ, ঐ আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে আমার বাড়ীতে আর থাকা চলবে না। তোমার জন্যে লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট হচ্ছে, তোমার ভাসুরের মুখ দেখান ভার হচ্ছে।"

প্রভা আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাঁদিয়াই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি পীড়িতা হইলেন। একে আশ্রিতা, তাহার উপর আবার পীড়া! তাঁহার যা ও ভাসুর তাঁহার উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। বীণা আর নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়, এখন সকলি বুঝে; তাহারই জন্য যে তাহার মায়ের এই কষ্ট ইহা বুঝিয়া সেও নির্জ্জনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত—"হে ঠাকুর, তুমি আমায় ডেকে নাও, আমার বাবা যেখানে গেছেন সেই খানে আমায় নিয়ে যাও, আমি আর মায়ের কষ্ট দেখতে পারি না।"

(৪).

প্রভা আপনার অবস্থা স্বামীর বন্ধু সুরেশচন্দ্রকে লিখিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে সুরেশচন্দ্র একদিন এই অনাথা বিধবার গল্প করিয়া পরিচিত সমাজে দুঃখ করিতেছিলেন। সেখানে এম্, এস্, সি, পাস করা কান্তিচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। কান্তি সব্‌জজের পুত্র। পর্ব্বতপ্রবাস কালে তিনি বীণাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি বিনা পণে বীণাকে বিবাহ করিব।"

উপস্থিত বন্ধুবর্গের সহিত সবিস্ময়ে সুরেশচন্দ্র ইহা শুনিলেন। কান্তিচন্দ্রকে তিনি বিশেষরূপ জানিতেন, তাহার কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। আশাতীত আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল, কান্তিচন্দ্রের পিতা ইহাতে সম্মত হইবেন কি? ধনবান পিতা কি বিনা পণে এই সহায়সম্পত্তিহীনা বিধবার কন্যার সহিত তাঁহার একমাত্র শিক্ষিত পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইবেন?

* * * *

সুরেশচন্দ্রের অনুমানই প্রথমে সত্য হইল। কান্তি-

চন্দ্রের পিতার নিকট যখন এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইল তখন ইহাতে তাঁহার অসম্মতিই প্রকাশ পাইল। অবশেষে অনেক যুক্তি তর্ক, অনুরোধ উপরোধের পর বীণাকে পুত্রবধু করিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন।

দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদের মত যখন এ সুসংবাদ প্রভার কর্ণগোচর হইল, পীড়িতা প্রভা তখন আনন্দাশ্রুতে বুক ভাসাইয়া পরিপূর্ণ প্রাণে যুক্ত করে পরমেশ্বরের চরণে আপনার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার মনে হইল দয়াময় হরি তবে বুঝি এতদিনে দুঃখিনীর কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। প্রভার মা মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বীণাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন বটে, কিন্তু বীণার এ সৌভাগ্য সূচনায় তিনি মরমে মরিয়া গেলেন; যেহেতু ছোট বৌটীর দর্প চূর্ণ হইল না। তা ছাড়া যে বীণাকে তিনি গলগ্রহ ভাবিয়া ও কেবলমাত্র তাহার আইবুড় নাম ঘুচাইবার জন্যই নিতান্ত অযোগ্য পাত্রে অর্পণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতেছিলেন না সেই বীণাই কি না শেষে তাঁহার কন্যাদের অপেক্ষাও অধিক সুখী হইতে চলিল! একি কম আপশোষের কথা! বীণার জ্যেঠাইমা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, হ্যাঁ অদেষ্টটা ভাল বটে! একেই বলে পাতা চাপা কপাল!

(৫)

কাল বীণার বিবাহ। অগ্রহায়ণ মাসের আর দিন নাই; কাল একদিনেই গায়ে হলুদ বিবাহ সব হইবে। উৎকণ্ঠিত চিত্তে বিনিদ্র নয়নে প্রভা প্রভাতের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন; শত সহস্র স্মৃতির তাড়নায় আজ তিনি শয্যা গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

প্রভাতে বরের পিতা সংবাদ পাঠাইলেন যে তাঁহার পুত্রের অন্য স্থানে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; পাত্রী হিমাংশু বাবুরই প্রতিবাসী রমেশচন্দ্র চৌধুরীর পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যা লতিকা। কন্যার পিতা চার হাজার নগদ ও দুই হাজার টাকার অলঙ্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বীণার জ্যেঠা মহাশয় যদি ইহা দিতে পারেন তবে তিনি বীণার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত আছেন। পত্রের শেষ পংক্তি বাদ দিয়া বীণার জ্যেঠা মহাশয় সকলকে পত্র শুনাইলেন। বীণার জ্যেঠাইমা ও পিসিমা এককালে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি অপয়া মেয়ে গো"! দণ্ডায়মানা প্রভার বক্ষে কি একটা বজ্র বেদনা বোধ হওয়ায় তিনি হঠাৎ পড়িয়া গেলেন!

... পিতার বহু চেষ্টা সত্তেও এ সকল সংবাদ কান্তিচন্দ্রের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না! পিতার বর্ব্বরতায় পুত্র বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বহু আয়াসে ক্রোধ দমন করিয়া কান্তি তাঁহার সংকল্পকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিলেন।

সন্ধ্যার পর নানা বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দ্দিক 'আলোকাকীর্ণ করিয়া মহা সমারোহে চৌধুরী বাড়ীতে লতিকার বরের শোভাযাত্রা আসিতেছে দেখা গেল। বীণাদের বাড়ীর রমণীগণ কোলাহল করিয়া ছাদ হইতে বর দেখিতে গেলেন! প্রভা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। বীণা মা'র বুকে মাথা রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল "মা, আমার একটী কথা রাখবে?" প্রভা কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "কি কথা মা?" "বল আর তুমি কাঁদবে না? মা আমাকে নিয়ে কি তুমি সুখী হও না? আমার বিয়ে নাই বা হ'ল? সত্য করে বল্‌ছি মা আমি কখন বিয়ে কর্‌ব না। আমি ত কত বইতে পড়েছি কত লোকে আজন্ম কুমারী থেকে দেশের সেবা করে; মা আমিও তাই করব, আর কিছু যদি না পারি শুধু তোমার সেবা ও দেশের অসহায় রোগীর সেবা করে জীবন কাটাব। তা দেখে কি তোমার আনন্দ হবে না মা? বল মা বল, আর তুমি কাঁদবে না?"

প্রভা উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া মৃদু হাসিয়া

বলিলেন "আচ্ছা মা তাই হবে; অনেক কেঁদেছি আর কাঁদব না, তাহলেই ত তুই সুখী হবি বীণা ?"

বীণা মায়ের কথার উত্তর বাক্যে না দিয়া সানন্দে মায়ের গলা ধরিয়া মা'র মুখে চুম্বনের উপর চুম্বন করিয়া স্থির দৃষ্টিতে মা'র মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার নীল তারকা বিশিষ্ট উজ্জ্বল চক্ষু দুটী হইতে আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়া মায়ের সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করিতে লাগিল।

বিবাহ বাড়ীর আনন্দ রোল মধ্যে মধ্যে উন্মুক্ত জানালা দিয়া প্রভার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। বরের সমারোহ, যাত্রীর কলরব নিকটতর হইতেছিল। প্রভা বীণাকে বলি-লেন—"বীণা, আমি ত তোমার কথা রাখিলাম আজ তুমিও আমার একটি সাধ পূর্ণ কর।" বীণা সানন্দে জননীর আদেশ পালন করিতে চাহিল।' বীণার বিবাহের সকল আয়োজনই হইয়াছিল। রোগক্লিষ্টা শীর্ণদেহা প্রভা পূর্ণ উৎসাহে সযত্নে বীণাকে বধূবেশে সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। আলুলায়িত-কুন্তলার কেশ রচনা করিয়া দিলেন। সযত্নে মুখখানি মুছাইয়া সুন্দর ভ্রুযুগলের মধ্যে টিপ দিয়া সুবাসিত মনোহর নীল রেশমী পরিচ্ছদ পরা-ইলেন তারপর গলায় একগাছি প্রফুল্ল কুসুমের মালা পরাইয়া উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে অনিমেষ অতৃপ্ত নয়নে

কিছুক্ষণ তাঁহার স্বর্ণপ্রতিমা বীণাপাণির মুখখানি দেখিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া মাটীতে পড়িল। বীণা অভিমানের সুরে বলিল—"মা আবার!" সজল চক্ষে মৃদু হাসিয়া প্রভা বলিলেন—"না মা, আর না। তুই কাছে আরো সরে আয় বীণা, একবার প্রাণ ভরে তোকে দেখি।"

বিবাহ বাড়ীতে নহবৎ বড় মধুর বাজিতেছিল, পূর্ণিমার চাঁদ চারিদিকে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া হাসিতেছিল; সেই জ্যোৎস্নারাশির মাঝে মায়ের মুখপানে চাহিয়া বীণা বসিয়া রহিল।

"আর পারিনা বীণা, আলোটা নিবিয়ে দে" বলিয়া দারুণ বক্ষ বেদনা অসহ্য হওয়ায় প্রভা অবসন্নভাবে শয্যা গ্রহণ করিলেন। বীণা ভীত ও ব্যথিত চিত্তে বলিয়া উঠিল —"ওকি মা অমন কচ্চ কেন? তোমার কি বড় বেশী কষ্ট হচ্চে?" প্রভা বলিলেন "কষ্ট কি মা! আমার কষ্টের শীঘ্রই অবসান হবে।" এমন সময়ে বাহিরে কিসের কোলাহল শুনা গেল। বরের বাপের তর্জ্জন, চৌধূরী মহাশয়ের অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়া বরবেশী কান্তিচন্দ্র হিমাংশুনাথের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। বরকে নিজেদের বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া হিমাংশুনাথের পুরস্ত্রীগণ

বিস্ময়ে কলরব করিতে করিতে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। কান্তিচন্দ্র তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বীণার মা কই ? আমি বীণাকে বিবাহ করতে এসেছি।" অমনি হুলুধ্বনির সহিত বিবাহের মঙ্গল শঙ্খ উচ্চ নিনাদে বাজিয়া উঠিল, শয্যাশায়িতা প্রভা একবার শিহরিয়া উঠিলেন।

বীণার জ্যেঠাইমা ছুটিয়া ঘরে গিয়া রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন "ছোট বৌ, ছোট বৌ, ও ছোট বৌ! বীণার বর এসেছেরে শিগ্‌গির আয়!" তিনি ব্যস্ততাপ্রযুক্ত আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "বীণা, তোর মাকে জাগিয়ে দে কান্তি তোকে বিয়ে করতে এসেছে!"

বীণা হতবুদ্ধি হইয়া উদ্বেল ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল "মা! ওমা! মাগো!" প্রভার আর উত্তর পাওয়া গেল না।